মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার

শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার

বন্দিনী

উপন্যাস

১৯৭৫

দিনটা ছিল ঘোলাটে, ময়লা। এক টুকরো চটের ওপর বসে পূরো কড়াইশুঁটির দানা ছুলে রাখছিল। আঙুলের চাপে একটা কড়াইশুঁটি ফাটিয়ে দানাগুলোকে মুঠোর মধ্যে ধরতে গিয়ে একটা সাদা থল্‌থলে পোকা পর আঙুলে লেগে গেল।

চলতে চলতে হঠাৎ প্যাচপেচে কাদা ভর্তি গর্তে পা পড়ে গেলে সমস্ত শরীরটা যেমন ঘিন্‌ঘিনিয়ে ওঠে, এই মুহূর্তে তেমনই একটা ঘিন-ঘিনে শিহরণ পূরোর সমস্ত শরীরের মধ্যদিয়ে বয়ে গেল। এক ঝট্‌কায় ও পোকাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাটুর মধ্যে গুটিয়ে আনল হাতটা।

পূরোর সামনে আস্তো কড়াইশুটি, ছুলে রাখা দানা আর দানা বারকরা খোসাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল।

দু' হাঁটুর ফাঁক থেকে হাত দুটো বার করে বুকের ওপর চেপে ধরল ও। ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করছে বুকের ভেতরটা! মনে হলো ওর যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরটা ওই কড়াইশুটির মতই, যার ভেতরে পুষ্ট দনাগুলোর জায়গায় ঘৃণ্য পোকা বাসা বেঁধে ফেলেছে।

নিজের শরীরটার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রতি ওর ঘৃণা হতে লাগল। মনে হলো, নিজের পেটের মধ্যেই পুষ্ট হতে থাকা পোকাটাকেও ঝট্‌কা মেরে ফেলে দেয়, নিজের শরীরের সংস্পর্শ থেকে দূরে, ঠিক শরীরে বিঁধে যাওয়া কাঁটা যেমন নখ দিয়ে টেনে তুলে ফেলতে হয়, আগাছার মূল শুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে হয়, যেমন শরীরে লেপ্টে থাকা জোঁক্‌কে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়!

পূরো সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চলে যাওয়া দিনগুলো মেঘের মত একটার পর একটা ওইখান দিয়ে ভেসে যেতে লাগল যেন।

পূরো গুজরাত জেলার গ্রাম ছত্তোয়ানীর এক সাহুকরের মেয়ে। সাহুকর বটে, তবে সাহুকরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলেও পরিচয়টা কিন্তু সাহুকরই রয়ে গেল। সময়ের কুচক্রে পড়ে একেবারে বেহাল অবস্থা হয়েছিল সংসারের। শেষে বড় বড় ডেগ কড়াই, বাসন-কোষণ সব পূর্বজদের নাম খোদাই করা—সবই বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। সত্যকার এই কঠিন গ্লানি ভরা জীবন থেকে বাঁচবার জন্য পূরোর বাবা-কাকা গ্রাম ছেড়ে সিয়াম চলে গিয়েছিল। সেখানে তাদের দিন ফিরে গেল রাতারাতি।

পূরো তখন রীতিমত লম্প-ঝম্প করে বেড়াচ্ছে। আর ওর মায়ের কোলে তখন এক ছেলে। গ্রাম ছেড়ে যাওয়া সাহু পরিবার আবার নিজেদের গ্রাম ছত্তোয়ানীতে ফিরে এলো। পূরোর বাবা বন্ধক দিয়ে যাওয়া বসতবাটি ছাড়িয়ে নিয়ে বাপদাদার ইজ্জত রক্ষা করলো। যতটাকা এ বাবদে সুদ দিতে হলো. তার চেয়েও অনেক কম খরচে নতুন বাড়ী তৈরী হয়ে যেতো। তবু বাপদাদার সুনাম বজায় রাখতে দাঁতমুখ চেপে সব লোকসান সয়ে নিলো পূরোর বাবা।

তরিতরকারীর বাগান, বাড়ীর চারপাশ ঘিরে নানান গাছপালা লাগানো হলো। তারপর আবশ্যকীয় কিছু জিনিষের সুবন্দোবস্ত করে আবার সিয়াসে ফিরে গেলো পূরোর পরিবার। বাড়ী তো রইলোই। সেই সঙ্গে পূরোর বাবার সুখ্যাতিও রয়ে গেল গ্রামে। পরের বার যখন গাঁয়ে ফিরে এলো সে, তখন পূরো ঠিক চোদ্দ বছরের মেয়ে। ওব পরে এক ছোট ভাই, তার চেয়ে ছোট পর পর তিনটি বোন। এর পর পূরোর মা এখন আবার ষষ্ঠ সন্তানের প্রত্যাশায় দিন গুনছে।

সাহু পরিবার গ্রামে ফিরে এসে প্রথম যে কাজ করলো তা হলো কন্যা পূরোর জন্য পাত্র দেখা। পাশেরই গ্রাম রত্তোয়াল। সেখানকার এক স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। পূরোর মায়ের ভাবনটা ছিল যে আতুরের পাট চুকেবুকে গেলে, পরিশুদ্ধ হয়ে, তারপর উঠে পড়ে লাগবে। ভেবেই এসেছিল যে একবার কাঁধ থেকে পূরোর ভার না

নামিয়ে আর ফিরবে না।

পূরোর ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে গোয়াল ভরা হুধেল গাই, ছাগল যেমন ছিল, তেমন গাঁয়ের মধ্যে তাদের বাড়ীটাই ছিল একমাত্র পাকা বাড়ী। বাড়ীর মাথায় "ওঁ" শব্দটা বেশ বড় অক্ষরে লেখা ছিল। আর ছেলে দেখতে শুনতে ভাল এবং বেশ বুদ্ধিমানও বটে।

পূরোর বাবা পাঁচটা টাকা আর গুড়ের নাগ্‌ড়ি দিয়ে পাত্রকে বেঁধে ফেলেছিল। সেকালে গুজরাত জেলায় অদল-বদলের সম্বন্ধ খুব হতো। যে ছেলের সঙ্গে পূরোর বিয়ে পাকা হলো, সেই ছেলেরই বোনের সঙ্গে পূরোর ছোট ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলো ; যদিও পূরোর ভাইয়ের তখন বারো বছর বয়স হয়েছে কি না সন্দেহ। আর তার ভাবী বধ্‌ তো নেহাৎই শিশু তখনও।

হু' বছর পরে পরেই এক একটা মেয়ে। তিন তিনটে মেয়ের পর পর জন্ম দিয়ে পূরোর মায়ের মনটাই খারাপ হয়ে গেছলো। এখন, যখন আবার সুদিন হয়েছে, মনের আশ মিটিয়ে খাওয়া-পরার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে ঘরে, তখন তার মন আবার একটা পুত্রের আকাঙ্খায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

এইবার ফিরে এসে পূরোর মায়ের দ্বিতীয় কাজ হলো বিধিমাতার পূজা। গাঁয়ের কজন এয়ো স্ত্রী পূরোদের ঘরের উঠোনে গোবরমাটি দিয়ে একটা পুতুল গড়লো। লাল রঙের চিক্‌ চুমকি দিয়ে সেই পুতুলকে সাজিয়ে মাথায় ঘোমটার মত দিয়ে দিল। চুমকি বসানো সুন্দর কাপড় উড়তে লাগল বাতাসে। হুই মাশা পরিমান সোনা দিয়ে নথ বানিয়ে তার নাকে পরিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সকলে মিলে সুর করে গান ধরল ঃ

বিধ্‌মাতা রুস্‌সী আবীঁ তে মন্নী জাবীঁ,
বিধ্‌মাতা রুস্‌সী আবীঁ তে মন্নী জাবীঁ।...

নিজেদের এই গাঁয়ে তো বটেই, আশপাশের গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক পুত্র সন্তানের জন্মের সময় স্বয়ং বিধিমাতা উপস্থিত হন। যদি বিধিমাতা তাঁর স্বামীর সঙ্গে হাসি-

ঠাট্টা করতে করতে আসেন, তো এসেই চট্‌পট্ একটা মেয়ে তৈরী করে দিয়ে চলে যায়। কেন না, তাঁর তখন স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ততা থাকে। কিন্তু, যদি বিধিমাতা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে রাগ করে কলে আসেন, তখন তো তাঁর ফিরে যাবার কোন তাড়া থাকে না। তখন তিনি অনেক সময় ধরে বসে, ধীরে ধীরে, বেশ যত্ন করে ছেলে তৈরী করে দেন। তাই সব এয়োরা মিলে আবার গান শুরু করে :

বিধ্‌মাতা রুস্‌সী আবীঁ তে মন্নী জাবীঁ···

বিধিমাতা বোধহয় কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে শুনছিলেন, এয়োদের প্রার্থনা তিনি শুনে নিলেন। পনের-ষোল দিন পর পূরোর মায়ের একটি পুত্রলাভ হলো। সাছুর দূর দূরান্তে থাকা বান্ধবদের কাছেও এই সুসংবাদ পৌঁছে গেল। চিন্তার ব্যাপার শুধু একটাই ছিল। ছেলেটার ত্রিদশা ঘটেছে। তিন বোনের পর ভাই হয়েছে। পূরোর মায়ের তো খুবই চিন্তা, রামজীর দয়াতে ছেলেটা যেন কোন প্রকারে বেঁচে যায়। আর বেঁচে যদি যায় তো মা-বাবার বোঝা না হয়েই যেন বাঁচে। বিধিমাতাকে তুষ্ট করেছিল যারা ছেলের জন্মের আগে সেই সব এয়োস্ত্রীরা আবার একত্র হলো। তারপর একটা বড়সড় কাঁসার থালার মধ্যিখানে বেশ বড় একটা ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে ছেলেকে এদিক ওদিক ঢুকিয়ে বার করে সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগল :

ত্রিখ্‌লাং দী ধাড়্ আয়ী,
ত্রিখলাং দী ধাড়, আয়ী।···

তিন তিনটে মেয়ের জন্মের পর ঈশ্বরের কৃপায় যে ছেলে জন্মেছে তার মঙ্গলের জন্য সবরকম পুজা-প্রার্থনা করার পর সকলের মনেই এই বিশ্বাস জাগলো যে ছেলেটা বেঁচে যাবে এ যাত্রা।

পনের বছর বয়সে পা দিতে না দিতেই পূরোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একেবারে যৌবনের বান ডাকল। আগের বছরের একটাও কামিজ-

জামা পূরোর পুষ্ট শরীরে আর ঢুকতেই চাইল না। পূরো কাছেই, বাজারের একটা দোকান থেকে বেশ ফুল ফুল বসানো ছিটকাপড় এনে নতুন কুর্তা-কামিজ সেলাই করিয়ে নিল। তারপর কত যত্ন করে তাতে চুম্‌কী বসালো।

পূরোর সব সখী বান্ধবীরা ওকে দূর থেকেই ওর ভাবী বর রামচন্দ্রকে দেখিয়ে দিয়েছিল। পূরোর চোখে তার ছবি একেবারে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত বসে গিয়েছিল। বরের কথা মনে হলেই পূরোর মুখ একেবারে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো।

নিঃশঙ্ক হয়ে কচিৎ কদাচিৎ বার হ'তে পারতো পূরো। কেননা, পাশের গাঁয়ের লোকেরা ওদের এই গাঁয়ে নানা কাজে অনবরতই যাতায়াত করতো। ওর শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের লোকেরা ওকে কখনও যেন দেখে না ফেলে, এই একটা ভয় সবসময়ই মনে জাগতো। তার ওপর আবার ওই গাঁয়ে মুসলমানদের বসবাস ছিল বেশী।

এমনিতে দিন ঢলে পড়ার আগেই পূরো ওর সখীদের সঙ্গে মিলে মিশে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে ফিরে আসতো। কখনও কখনও পূরো নিজেদের ক্ষেত-জমিনের পাশ দিয়ে যে কাঁচা সড়কটা চলে গেছে, তার আশপাশে ঘুরে বেড়াতো; বা কখনও ধারে কাছে শাক্‌সব্জি তুলতে বসে যেতো; কখনও বা কোন জামগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকতো, বা ঢেলামেরে জাম ফেলতো, তারপর একটা একটা করে তুলে নিত। আর কলকল করে সখী-বান্ধবীদের সঙ্গে হাসি-মস্করা-কথার বান ছুটিয়ে দিত। ওই সড়ক ধরেই ওর হবু শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে চালে যাওয়াও যেতো।

মনে মনে ও ভাবতো, আজ হঠাৎই যদি ওর হবু বর এদিকে চলে আসে! এমনি। ঘুরতে ঘুরতে! তাহলে একটু আড়ালে গিয়ে নয়ন ভরে দেখে নিত ও! পূরোর বুকের ভেতরটা তাই এই সড়কের ধারে এসে দাঁড়ালেই ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠতো। সেদিন সারাটা রাত কেটে যেতো পূরোর সুস্থ যুবা হবু বরকে স্বপ্নে দেখে দেখে।

একদিন পূরো নতুন জুতো পরে পায়ের ব্যাথায় অস্থির হয়ে উঠলো। বান্ধবীদের সঙ্গে চলতে গিয়ে বারে বারে ও পিছিয়ে পড়ছিল। তারপর এক সময় ওরা ক্ষেত-জমিন ঘুরে দেখে বাড়ীর দিকে ফিরছিল। সন্ধ্যের আঁধার তখন ঘষা পয়সার মত চারিপাশে নেমে এসেছিল। ক্ষেতের আলপথ দিয়ে দিয়ে এসে ওরা বাড়ীর পথের পাকদণ্ডীটার মুখে এসে পড়েছিল। এই পাকদণ্ডী পথটা কোথাও চওড়া আবার কোথাও বা ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে, বা দু-চারটে ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে চলে গেছে। মেয়েরা সব আগু-পিছু হয়ে লাইন বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল। পূরোর ডান পায়ের গোড়ালীতে ফোস্কা পড়ে গেছে। পূরো রাগমাগ করে শেষে দু'পা থেকেই জুতো খুলে হাতে নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে যেতে লাগল।

পূরোর বান্ধবীরা ওকে বলতো যে ওর ডান পা বাঁ পা'য়ের চেয়ে বড় আর ভারী। সে জন্যে জুতো পরলে ডান পায়ে লাগে। ঠিক পায়ের মত ওর ডান হাতও বেশ পুরুষ্টু, ভারী, ওর বাঁ হাতের চেয়ে। 'হ্যাঁ রে, সত্যি। দেখিস, হাতে চুড়ি পরার সময় বুঝতে পারবি—' এই সব বলে ওর সখীরা ওকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করত। পূরোর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবিটা, ঠিক যেন আসল হাতীর দাঁতে তৈরী লালরঙের চুড়ি ওর হাতে পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগের বড় আকারের চুড়ি হাতে পরার পর ঈষৎ ছোট আকারের চুড়িগুলো ওর ডান হাতে আটকে গেছলো। নাপিত-বউ আঙ্গুলে-কব্জিতে তেল লাগিয়ে হাড়শুদ্ধ চেপে ধরে হাতীর দাঁতের লাল চুড়িগুলো জোর দিয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। পূরোর হঠাৎ মনে হলো, যদি হাতীর দাঁতের লাল চুড়িগুলো ওর ডান হাতে ঢোকাতে গিয়ে ভেঙ্গে যায়! পূরোর হৃদপিণ্ডে দড়াম্ করে একটা ধাক্কা লাগল যেন! হায়! কি সব অলক্ষুণে চিন্তা! ওর মঙ্গল-চিহ্ন, ওর স্বামীর মঙ্গল-চিহ্ন এই চুড়ি, ওর হাতে ভাঙ্গবে কেন! পূরো ওর ডান হাতের দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকালো। ভগবান!

ওর ভাবী স্বামী যুগ যুগ বেঁচে থাকুন। হাজার-লক্ষ বছর বেঁচে থাকুন! পুরোর হৃদয় আকুল কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো! পুরোর সেই মুহূর্তে মনে পড়ল, ওদের গাঁয়ে মঙ্গল-চুড়ি পরাবার সময় একটা মেয়ের হাতের চুড়ি সত্যি সত্যি ভেঙ্গে গেছলো। পাশের দাঁড়ানো এয়োস্ত্রীরা সবাই 'হায়! হায়! রাম! রাম!' বলতে বলতে ভগবানের কাছে মেয়ের পতির মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর একজন সেঁকরার কাছ থেকে পাতলা সোনার তার তৈরী করে, চুড়ির মধ্যে পরিয়ে জুড়ে দিয়ে মেয়েটার হাতে ফের চুড়ি পরানো হলো। এইভাবেই যেন সেই মেয়ের পতির ছিঁড়ে যাওয়া জীবন-তার আবার জুড়ে দেওয়া হলো।

পুরো এইরকম সব মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তায় মগ্ন হয়ে যখন দ্রুত পায়ে হাঁটছিল, সেই সময় বাঁ দিক থেকে, পিপুল গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে একজন লোক একেবারে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। পূরোর বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডে যেন খুব জোরে একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল! পূরো চট্ করে দেখে নিল যে ওদেরই গাঁয়ের জোয়ান ছোকরা রশীদ ওর সামনে দাঁড়িয়েছে এসে। রশীদের বয়েস বাইশ-চব্বিশ হবে। তার ভরন্ত যৌবনের শক্তির প্রকাশ মুখে চোখে স্পষ্ট।

পূরো দেখল, রশীদের দুটো বড় বড় চোখ পুরোর মুখের ওপরেই যেন আটকে গেছে। কেঁপে উঠল ও! ওর মুখ দিয়ে আচমকা একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই রশীদকে এড়িয়ে ও দৌড় দিল!

দৌড়তে দৌড়তে একেবারে ওর সখীদের কাছে গিয়ে থামল! তখন ওদের বাড়ীর অন্যকটা কাছেই এসে পড়েছে ওরা। পুরো তখনও হাফাচ্ছিল। বাঁচা গেছে যে রসীদ ওর গায়েও হাত দেয় নি বা মুখেও কিছু বলে নি।

'আরে! কোনো ছেলে না বাঘ ছিল, অ্যাঁ?' সখীদের দল ওকে ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু পূরো তখনও যেন বুক ভরে দম

নিতেই পারছে না।

'আরে, বাঘ তো সেরেফ ধরে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে, কিন্তু যদি কোন দানোতে কোন মেয়েকে ধরে তো তাকে না মেরে ফেলে সোজা নিজের গুহাতে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে নিজের বৌ বানিয়ে রেখে দেয়।' সখীদের মধ্যে—একজন বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বলল।

কথাগুলো শুনে পুরোর বুকের ভেতরটা যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। হায়! সেই হতভাগীনীর কি দুর্দশাই না হয় যাকে দানো তার বৌ বানিয়ে রেখে দেয়! ভাবতে ভাবতে পুরোর মুখ চোখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রশীদের সেই বড় বড় লোভী চোখের দৃষ্টি যেন গ্রাস করে ফেলতে লাগল ওকে।

পুরো বাড়ীতে পৌছে গেল। ওর সখীরা হাসি ঠাট্টা করতে করতে যে যার ঘরের দিকে চলে গেল।

দ্বিতীয় দিন পুরো আর ওর সখীরা যখন ক্ষেত থেকে শুঁটি তুলছিল, তাড়াতাড়ি দু' মুঠো ভর্তি শুঁটি নিয়ে পাশেই ক্ষেতে জল আসার বহতা নালিতে ধুতে এল পুরো। ছোট ছোট শুঁটির দানা কয়েকটা এরই মধ্যে ছাড়িয়ে মুখে ফেলে চিবোচ্ছিল ও। ধুতে ধুতেই ওর নজর পড়ল ক্ষেতের সীমায় একটা গাছের আড়াল থেকে রশীদ ওকে দেখছে। পুরোর নজর পড়েছে দেখেই রশীদ খানিকটা এগিয়ে এল। মুহূর্তে যেন দুই পা থেকে কেউ শেষ শক্তিটুকুও কেড়ে নিল পুরোর। একটা আতঙ্ক ওর মুখের আকাশে আঁধার হয়ে নেমে এল!

'আরে, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো তোমার একজন গোলাম।' আজ রশীদ কথা বলে উঠল। মুখে তার দুষ্টুমী ভরা হাসি।

পুরোর মনে হলো যেন রশীদ এক্ষুণি সেই দানোটার মত ধারালো চওড়া পাঞ্জা দিয়ে ওর মুখের ওপর ঝাপ্‌টে পড়বে, তার লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো দানোটার বিরাট নখওয়ালা আঙ্গুলগুলোর মত ওর গলার ওপর চারপাশ থেকে চেপে বসবে। তারপর সেটা ওকে

টানতে টানতে নিয়ে যাবে এবং তারপর······তারপর···?

সৌভাগ্যই বলতে হবে, পূরো দেখল যে সামনে থেকে দুজন চাষী এদিকে আসছে। রশীদ তেমনই দাঁড়িয়ে। পূরো লাল লাল টমাটো ভর্তি গাছগুলোর ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে সখীদের দলের মধ্যে এসে পড়ল।

সেদিনটা বড় ভয়ে ভয়ে কাটল পূরোর। ফেরার সময় সারাটা রাস্তা সখীদের কারো না কারো হাত ধরে চলতে লাগল ও। ছায়া দেখলেও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল ও, একটু আধটু শব্দতেই চমকে চমকে উঠছিল।

পূরো অবশ্য এসব কথা মা বা বাবাকে কিছুই বলল না। ওর সখীরা বলেছিল যে এসব কথা আবার কাউকে বলার মত নাকি! যুবতী মেয়েদের পাশাপাশি রাস্তায় চলতে চলতে পুরুষমানুষরা অমন দেখেই থাকে। কোন কোন সময় কেউ কেউ মুখে বলেও উঠে যে আমি তোমার গোলাম বা আমি তোমার পায়ের চাকর। এসব আলতু কালতু কথার কোন মানে তো হয় না। তারা যতই বক্‌বক্ করুক, ঘাউ ঘাউ করুক। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বলে কেউ রাস্তায় চলা বন্ধ করে দেয়!

সেদিন ওদের গ্রামে একটা ছ'সাত বছরের ছেলেকে একটা পাগলা কুকুর কামড়ে দিল। গলি মহল্লার এয়ো স্ত্রীরা সবাই মিলে ছেলেটার কামড়ের ঘায়ে লাল লঙ্কা বেঁধে দিল। লঙ্কার তেজে কুকুরের দাঁতের বিষ কেটে যায়। পূরোর কানে এই খবরটা যেতে ও তক্ষুনি মনে মনে ভাবল যে ওই রকম লাল লঙ্কা বাটা রশীদের দু'চোখের মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো। যতই ওর রশীদের চোখ দুটোর কথা মনে পড়ছিল ততই ওর মনের মধ্যে আক্রোশের বিষ বাড়ছিল।

ওর সখীরা সব হাত ধরে টানছিলো, কিন্তু পূরোর আর সাহস হচ্ছিল না ক্ষেতের দিকে যেতে।

এদিকে ওর বিয়ের দিন তো ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

পূরোর বাবা ঘি আর ময়দা কিনে ঘর বোঝাই করে ফেলেছে। ওদিকে পূরোর মা হলুদে রেশমের গুটি থেকে লাল ফুলকারি সব কাঠের সিন্দুকে বোঝাই করে ফেলছে। শ্যামদেশ থেকে নিয়ে আসা রেশমী জোড়া সব পনের জন্য ঠিক করে রাখা সাদা ট্রাঙ্কটাতে ভর্ত্তি করে ফেলেছে। চুমকির ছোট ছোট বাঁকড়ি বেছে বেছে তুলতে গিয়ে তো কোমর ব্যথা করতে লাগল তার। বাড়ীর পেছন দিকের ভেতরের একটা ঘরে যেখানে পূরোকে দেবার জন্যে, পনের সর্ত্ত হিসেবেই, পেতলের ঠিক একান্নটা বাসন রাখা হয়েছে, সব যেন ঝমাঝম করে নাচছে। সেই সময় দেহাতের দিকে কুরুশ কাঁটায় চলন বেশ হয়েছিল। পূরো কুরুশে বোনা ফুল জুড়ে জুড়ে পালঙ্কে বেছানোর চাদরটা সুন্দর করে তুলেছিল। দু-সূতোর তার গুনে গুনে ও বেশ ফুল তৈরী করতে শিখে নিয়েছিল। নিজের হাতেই নিজের বিয়েতে পন দেবার জন্য ডালা আর মোড়া তৈরী করে নিয়েছিল।

একদিন পালং-এর নরম নরম পাতা তুলে নিয়ে পূরো ছোট ছোট করে কাটল। পূরোর মা তখন সূতলী দিয়ে বোনা আসনের ওপর বসে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। পূরো মাটির হাঁড়িগুলো খড় দিয়ে বেশ ভাল করে মাজলো। শাকগুলো দুবার জল দিয়ে ধুয়ে তারপর —ছোলার ডাল দিয়ে একটা হাঁড়ি মুখ পর্যন্ত ভরে নিল। ঢিমে আঁচের উনুনে দুধের পাত্র থেকে উথলিয়ে পড়ছিল দুধ। দুধের পাত্রটা নামিয়ে উনুনে আরও দুচারটে লকড়ি গুঁজে দিলো। আগুনটা বাড়িয়ে শাক ভর্ত্তি হাঁড়িটা চড়িয়ে দিল তারপর।

পূরোর বিয়ের দিন বলতে গেলে এসেই পড়েছে। পূরোর মা তো প্রতীক্ষা করেই বসে আছে আজ অথবা কাল পূরোর হবু শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ মাপ-টাপ নিতে এসে যাবে। পূরো তো সুন্দর, শান্ত মেয়ে! অথচ, কাজে কর্মে চট্‌পটে। পূরোর বান্ধবীরা তো সবাই বলে যে পূরোর এখন ভরপুর যৌবন। পূরো ফর্সা, নির্মল মুখশ্রী, চোখ ফেরানো যায় না। তবুও পূরোর মা

আকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকালো। হয় তো মনে মনে ভাবলো যে পূরো যখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে, তখন পূরোর বাপের বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। পূরো তো মায়ের ডান হাতের মত। ভাবতেই মায়ের চোখ ছুটি জলে ভরে উঠল। একদিন সব মেয়েরই মায়েদের তো কাঁদতে হয়। বসে বসেই পূরোর মা গান গেয়ে উঠল গুন্ গুনিয়ে ঃ

লাবীঁ তে লাবীঁ নী কলেজে দে নাল মা এ,
দস্সী তে দস্সীঁ ইক্ বাত নীঁ।
বাতাঁ তে লম্মীয়াঁ নী ধীয়াঁ কিউ জম্মিঁয়ানীঁ,
অজ্জ বিছোড়ে ওয়ালী রাত্ নীঁ।

বুক ভার হয়ে এলো পূরোর মায়ের। পূরো কাজ করতে করতেই মায়ের গুন্গুনানি শুনছিল। শুনতে শুনতে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে পূরোর বুকের মধ্যেও যেন মোচড় দিয়ে উঠল। পূরোর মা তখনও গেয়ে যাচ্ছে ঃ

চর্খা জু ডাহ্নীয়াঁ ম্যয় ছোপে জু পানীয়া ম্যয়,
পিড়িয়াঁ তে বালে মেরে খেস্ নীঁ।
পুত্রাঁ নু দিত্তে উচ্চে মহল তে মাড়িয়াঁ
ধীয়াঁ চু দিত্তা পরদেস্ নীঁ।

পূরো দৌড়ে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে মিশে গেল। মা-মেয়ে দুজনেই অঝোরে কাঁদতে লাগল। সব মেয়েরই যৌবন একদিন তাদেরকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

পূরোর মা অবশেষে সামলে নিল নিজেকে। মেয়ের কাঁধে পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করল। সন্ধ্যার আঁধার তখন তাদের উঠোনেও ছায়া ফেলেছে। পূরোর মায়ের হঠাৎ মনে পড়ল যে ঘরে এমন দ্বিতীয় বস্তু কিছু নেই যে উনুনে চড়িয়ে দেবে। কে জানে পূরোর শ্বশুর বাড়ী থেকে কেউ এসে পড়ে পড়ে কি না!

পূরোকে ডেকে মা বলল যে ছোট বোনটার হাত ধরে নিয়ে পাশের ক্ষেত থেকে কয়েকটা ঢ্যাঁড়শই না হয় তুলে নিয়ে আয়।

খা! আর এক মুঠো চাল গুড় দিয়ে জ্বাল দিয়ে একটু মিষ্টি ভাত তৈরী কর ফিরে এসে।

পূরোর বুকের মধ্যেও আজ থেকে থেকে একটি আবেগের ঢেউ উঠে আসতে চাইছিল। ও ছোট বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

পূরো কিছু ঢ্যাঁড়শ তুললো, ছু'চরেটে সিঙ্গারাও তুলে নিল। তারপর ছোট বোনের হাত ধরে ঘরের পথে ফিরল। হাঁটতে হাঁটতে পূরোর মনে নানান কথা ভীড় করে আসছিল।—মায়ের কাছ থেকে এবার ওকে দূরে চলে যেতে হবে, বোনেদের কাছ থেকেও দূরে সরে যাবে, আর ছোট্ট ভাইটা—তার সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। হঠাৎ ভয়ানক বজ্রপাতের মত একটি চিন্তা ওর মাথার মধ্যে বিদীর্ণ হলো, যদি এখানে রশীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

সঙ্গে সঙ্গে ও অতি দ্রুত করে চলতে সুরু করল। 'পূরো, দৌড়চ্ছিস কেন?' পূরোর ছোট বোনটা তাল রাখতে গিয়ে হাঁকতে হাঁকতে বলল।

পূরোর পেছন দিক থেকে একটি ঘোড়া ছুটতে ছুটতে আসছিল। পূরো তখনও পাকদণ্ডী থেকে সরে দাঁড়াতে পারে নি, ওর ডান কাঁধে একটি ধাক্কা লাগল। ঘোড়া না ঘোড়সওয়ার কার সঙ্গে লাগল তা ঠিক বুঝতে পারল না পূরো। পড়েই যাচ্ছিল ও। ঠিক তখনই কেউ ওকে ওর কাঁধে হাত দিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। পূরোর প্রাণ ফাটানো চিৎকার ঘোড়ার দ্রুত কদমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হয়ে গেল। ওর বোন সেখানেই দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কে জানে ওই ঘোড়া কোথা থেকে এসেছিল, সওয়ারই বা কে ছিল, কতক্ষণ ধরে ঘোড়া ছুটেছে তারপর। পূরো অজ্ঞান পড়েছিল।

পূরোর যখন হুঁশ এল, ও তখন একটি ঘরে একটি চারপাইয়ের ওপর পড়ে আছে। চারদিকে দেয়াল। কেবল সামনে একটি দরজা।

পূরোর সব মনে পড়ে গেল। ও দেয়ালে মাথা কুটতে লাগল,

দরজার ওপরে মাথা কুটতে লাগল।

শেষে নিরুপায়, ক্লান্ত হয়ে আবার চারপাই (দড়ির খাট)-এর ওপর আছড়ে পড়ল। আবার অজ্ঞান হয়ে গেল ও।

পুরোর আবার যখন জ্ঞান ফিরল, কেউ তখন ওর মাথায় গরম ঘি মালিশ করছিল। পুরোর একবার মনে হলো, বুঝি ওর মা ওর শিয়রে বসে আছে। পুরোর শরীরে ধুম জ্বর এল।

'আমার দোষ হয়েছে, মাফ কর পুরো, সুস্থ হয়ে ওঠ!' কেউ একজন শিয়রে বসে আছে। সে বলল।

জ্বরের তাপে শরীর জ্বলছে, তবু মাথা তুলে দেখল পুরো। রশীদ ওর শিয়রে বসে আছে। পুরো এক চিৎকার দিয়ে আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

পুরো দেখল, কালো কুৎসিৎ লোমওয়ালা একটি কদাকার ভাল্লুক ওর মাথার চুলের মধ্য দিয়ে তার ধারালো নখওয়ালা পাঞ্জা কিলবিল করে ঘুরছে। পুরো একটি গুহার মধ্যে বন্দিনী, দেহটি ওর কুঁকড়ে যাচ্ছে থেকে থেকে, ভাল্লুকটি ক্রমশঃ ওর কাছে আসছে, তার রোমশ বাহু দুটি দিয়ে ক্রমশঃ পুরোকে জড়িয়ে ধরছে।

পুরো বড় বড় চোখ করে তাকালো। কেউ ওর পায়ের তলাটায় হাত বোলাচ্ছিল। আবার কেউ ওর কাঁধে আলতো চাপড় দিল, যেন মালিশ করছে, টিপে দিচ্ছে। তারপর কেউ ওর মুখে ঝিনুক দিয়ে বারে বারে জল খাইয়ে দিচ্ছে।

ভাল্লুকের গুহা না রশীদের ঘর? পুরোর মাথা ঘুরছিল। আবার বুঝি ও ঘুমিয়ে পড়ল।

পুরোর সবই মনে ছিল, মায়ের মুখ, নিজেদের গ্রামের কথা। আসলে ওর কেবলই মনে হচ্ছিল যেন এই গুহার মধ্যে পড়ে পড়েঃ কতগুলো বছর বুঝি কেটে গেছে। রশীদের মুখ দেখতে দেখতে যেন ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রশীদও ওকে কখনোও কিছু বলেনি বা ও নিজেও কখনো রশীদকে ডাকেনি। শুয়ে থাকা পুরোর মুখে জল দেওয়া বা গরম করা গুড় আর ঘি চামচ দিয়ে দিয়ে রশীদ ঢেলে

দিত। কখনও হয়ত এক আধ ঢোক গলা দিয়ে নেমে যেতো, নয়তো পূরো থু থু করে ফেলেই দিত বেশীর ভাগ সময়।

তারপর একদিন পূরো সাহস ভরে দেয়ালে পিঠ রেখে চারপাইয়ের ওপর উঠে বসল।

'আমি কোথায়?' পূরো জিজ্ঞেস করল।

'আমার কাছে।' রশীদ চারপাইয়ের সামনে একটা টুলে বসেছিল। তার মুখ নীচের দিকে ঝোঁকা। আজ তার চোখ এক দৃষ্টিতে পূরোর মুখের দিকে আর যেন তাকাতে পারছিল না।

'তুই এখানে কেন নিয়ে এলি আমাকে?' পূরো সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারল।

'অন্য এক সময় বলব।' রশীদ এই কথা কটা বলেই বাইরে চলে গেল। পূরো গুম্ হয়ে বসে রইল চারপাইটার ওপর।

এখন ঘরের দরজা খোলা। পূরো দেখল যে বাইরে ছোট একটা দালানের মত রয়েছে। দালানের সঙ্গেই ছোট একটা গলি মত। আর তারপরই বাইরের দরজা।

পূরো কাঁপতে কাঁপতে উঠল। চারপাশের দেয়ালগুলোর দিকে দেখল একবার। ভয় পাচ্ছিল ও। এক্ষুনি হয়তো কেউ এই দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসবে, আর ওর হাত ধরে হেঁচকা মেরে চারপাইয়ের ওপর ফেলে দেবে। কিন্তু দেয়াল ভেদ করে কেউ এল না। পূরো বাইরের দালানে এসে দাঁড়াল।

উঠোনের এক কোণে একটা উনুন। আগুন নিবে গেছে। পাশেই একটা হাঁড়ি, তাওয়া পরাত পড়ে আছে। জলের ঘড়া একটা ভর্তি। পড়ে আছে সেটাও এক ধারে। কিন্তু মানুষজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

পূরো কাঁপা কাঁপা পায়ে অলিন্দ পেরিয়ে বাইরের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। পিছু ফিরে একবার কুঠরীর দিকে তাকালো। তারপর দরজা ঘেসে দাঁড়াল।

কিন্তু দরজা বন্ধ। পূরোর মন্দ ভাগ্যের মতই। বন্ধ দরজার

ওপরেই মাথা চেপে ধরল পূরো। কিন্তু বন্ধ দরজা পূরোর মাথার প্রতি কোন দরদ দেখাল না; না ওর ভীত, ক্লান্ত শরীরকে তাকিয়ে দেখল বা অশ্রুসিক্ত চোখ দুটির জন্য কোনরকম বিচলিত হলো।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুখ মুছতে মুছতে দরজার কাছ থেকে ফিরে এল ও। ঘড়া থেকে জল ঢেলে নিয়ে দুচোখে ঝাপ্টা দিল। তখন মনে হলো দরজায় দমাদম্ শব্দ করে দেখলে হয়। আশে-পাশের বাসিন্দা বা পথচলা কোন পথিক শুনলেও শুনতে পারে।

উঠোনের সীমায় কাঁচামাটির উঁচু দেয়ালের দিকে তাকাল একবার ও। তাবপর সাহস ভরে দরজা পিটতে আরম্ভ করল। একসময় পূরো দুই দরজার মাঝের এক ছিল্‌তে ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। যতদূর দৃষ্টি গেলো মাঠ, মাঠের পর সীমাহীন মাঠ। কোন বাড়ী বা বস্তি কিছুই নজরে পড়ল না। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। না জানি কোন্ এক জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল ও।

দরজার কাছেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে পূরো। তখনই বাইরের দিক থেকে দরজা খুলল। রশীদ ভেতরে এসে দরজা ফের্ বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। পূরো ঠিক সেখানেই, সেই অবস্থাতেই বসে পড়ল।

'পূরো! কেন খামোখা বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছিস্। ভেতরে চল, মুখে কিছু দে; গত দুদিন ধরে কিছু খাস্‌নি তুই।' রশীদ সেখানে দাঁড়িয়েই বলল। হাত ধরে ওঠালোও না পূরোকে, বা ওর দিকে আগের মতন বড় বড় চোখে তাকিয়েও দেখল না।

"আমাকে দয়া কর, রশীদ! আমাকে ঘরে যেতে দে।" পূরো রশীদের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এইবার রশীদ পূরোকে তার লাঠির মত শক্ত দুটি হাতের শক্তিতে তুলে ধরল'। তারপর খালি বস্তার মত নেতিয়ে পড়া পূরোকে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরল।

'আমার বকের এই আগুন কে নেভাবে?' রশীদ হাত-পা

ছুঁড়তে থাকা পূরোকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে রাখল।

সেইদিনও চলে গেছে, সেই রাতও চলে গেছে। রশীদ আর ওকে কিছু বলে নি। দরজা যেমনকার তেমনই বন্ধ ছিল, রশীদও তেমনই পাহারাদারিতে।

রশীদ ঘরের বাইরেও যেতো। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা কাটিয়েই আসত বাইরে। পূরো কয়েদই থাকতো। তারপর তারাভরা আকাশের নীচে পূরোর হাত ধরে বেড়াতে আরম্ভ করল বাড়ীর বাইরে। পূরো দেখল, এই বাড়ীটা ছাড়া সেই বিশাল লম্বা-চওড়া ময়দানে আর কোন ঘর বাড়ী নেই। রশীদের এই বাড়ীটার কাছে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো একটা বাগান। এই বাড়ীটা বোধ হয় আসলে ওই বাগানের মালীদের ঘর। বাগানে মালী অবশ্যই আছে। কিন্তু পূরো তাদের দেখেনি বা তাদের গলার আওয়াজও কখনও শোনে নি। পূরোর তো দিনটুকু যাওবা কোনো মতে কেটে যায়, রাত তো যেন আর কাটতেই চায় না। ওর কেবল এ পর্যন্ত একটাই সন্তুষ্টি যে রশীদ ওকে এখনও পর্য্যন্ত কোন রকম কটু-কথা বা কিছুই বলে নি। পূরোর মর্য্যাদাটুকু অন্ততঃ এখনও অক্ষুন্ন আছে। অবশ্য এটা আলাদা কথা যে রশীদের ওপর ওর প্রার্থনা বা গালাগালি দুটোরই কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, হয় নি এখনও।

পূরোর নিজের হিসেব অনুযায়ী তার এখানে কয়েদকাল পনের-দিন হয়ে গেল।

একদিন রশীদ লাল রঙের রেশমী জোড়া পূরোর সামনে এনে রাখল। এর আগেও বদলে পরার জন্য সূতীর জোড়া এনে দিয়েছিল সে পূরোকে। কিন্তু এবার লাল রেশমের জোড় পূরোর সামনে রেখে বলল, 'কাল সকালে স্নান-টান করে তৈরী হয়ে থেকো, মৌলবী সাহেব এসে আমাদের নিকাহ্‌ করিয়ে দেবেন।'

পূরোর বুকের ভেতরে ধ্বস্‌ নামল! এখনও পর্য্যন্ত যা হয়নি, তবে কি এখন সেটাই হতে চলল?

সেইদিন পূরো আবার রশীদের পা জড়িয়ে ধরল।

'পূরো। পারবো না, হবো না, এসব বলে কোন লাভ নেই। খামোখা আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপাস্‌নি। আমি মহান আল্লাহ্‌র দিব্যি গেলে বলছি, তোর কান্না আমি সইতে পারছি না।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রশীদ বলে উঠল।

পূরো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে রশীদ যদি এতটাই দয়াবান হয়, তাহলে বিপত্তির এই ভারী বোঝা সে কেন চাপিয়ে দিল ওর মাথার ওপর?

'তোকে তোর আল্লাহ্‌র দিব্যি দিয়ে বলছি, রশীদ। সত্যি করে বল, তুই আমাকে নিয়ে এমন কাজ করলি কেন?'

'পূরো! তোর আমার সম্বন্ধ কোন পুরোনো দেনা-পাওনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এখন সে সব কথা শুনে তোর কি লাভ হবে? যা হয়ে গেছে, গেছে। আমি জীবনভর এতটুকু কষ্ট দেব না তোকে।'

পূরো একেবারে হয়রান হয়ে গেল, মুহ্যমান হয়ে গেল। এ আবার কেমনতর লোক। 'পূরো! আমাদের সেখ বংশের সঙ্গে তোমাদের 'সাহু' বংশের সেই ঠাকুরদাদা, তার বাবার সময় থেকে একটা শত্রুতা চলে আসছে। তোমার ঠাকুর্দা পাঁচশো টাকাতে বন্ধক রাখা আমাদের বাড়ীটার ওপরে সুদের ওপর তস্য সুদ তো লাগালই, তারপর ক্রোকের পরোয়ানা লাগিয়ে 'সেখ' ঘরানাকে একেবারে বে-ঘর করে ছেড়ে ছিল। শুধু তাই না, তার মুন্সি-কারিন্দার দল আমাদের পরিবারের মেয়েদের প্রতি অশ্রাব্য কুশ্রাব্য তো করলই, তার ওপর আমার ঠাকুর্দার বড় মেয়েকে জবরদস্তি তোর ঠাকুর্দার বড় ছেলে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনরাত আটকে রেখে দিল। আমার ঠাকুর্দার চোখের সামনে সবকিছু ঘটল। কিন্তু সে সময় 'সেখ'-দের অবস্থা পোকালাগা আখের মত রসহীন হয়ে গেছল। তাদের চোখ ফেটে রক্ত অশ্রু বেরিয়ে আসতে চাইলেও নিঃশব্দে তাই হজম করে নিতে হলো। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা আমার খুড়ো-জ্যাঠাদের আর আমার বাবাকে কোরান-শরীফ ছুলে ধরে

এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে তারা যেন এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয় অবশ্যই। তারপর কালের নিয়মে সেই প্রতিজ্ঞা ঝিমিয়ে পড়েছিল। এবার যখন এই গ্রামেই তোর বিয়ের কাজ কর্ম হ'তে শুরু করল তো আমার খুড়ো-জ্যাঠার রক্তে আবার সেই প্রতিশোধের তুফান জেগে উঠল। তারা আমাকে দিব্যি দিয়ে, শপথ করিয়ে নিল, আমার রক্তেও ঝড় তুলল প্রতিশোধ নেবার, সাহুদের মেয়ের বিয়ে হবার আগেই যেন, যে কোন দিন, আমি মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাই।'—রশীদ হঠাৎ চুপ করে গেল।

পূরো খুব ধৈর্য্য ধরে নিজের কপাল-লিখনের কথা শুনছিল।

'পূরো! প্রথম দিনই, যেদিন তোকে আমি দেখলাম, খোদা-তালাহ্ আমার সাক্ষী, তোকে আমি ভালবেসে ফেললাম। একদিকে আমার এই ভালবাসার জোর, অন্যদিকে আমার ঘাড়-পিঠের ওপর সমস্ত 'সেখ' ঘরানাব মর্য্যাদার বোঝা। আমি তোকে দিব্যি করে বলছি, আমি তোর দুঃখ আর সহ্য করতে পারছি না।' রশীদ বলল।

পূরো দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরল।

'তোর পিসীকে আমার জ্যেঠা তুলে নিয়ে গেছল ; কিন্তু রশীদ! তাতে আমার কি দোষ ঘটলো? হায়! আমার তো সব ছারখার হয়ে গেল!' পূরোর মুখ অশ্রুকণায় ধুয়ে যেতে লাগল।

'আমিও তো তাই বলেছিলাম, কিন্তু আমার চাচা আমাকে ধিক্কার দিতে লাগল, টিট্‌কিরি কবতে লাগল।'

'তো রশীদ! উনি উস্কানি দিলেন বলে তুই আমাকে মেরেফেললি?' পূরো কাঁদতে কাঁদতেই বলে উঠল।

'পূরো! আমি সারা জীবন পৃথিবীর যাবতীয় কাম্য জিনিষ তোর পায়ের কাছে এনে এনে রাখব,' রশীদ গদগদ স্বরে বলল, 'আমি তোর জ্যাঠার মত কক্ষনও এমন করব না যে তিন রাত্রির পর বেচারী মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।'

'রশীদ! একবার আমাকে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা

করতে দে!' পূরো কেবল এই আবেদনটুকুই করতে পারল।

'হায়রে! সেই সময় আর নেই! এখন ওই বাড়ীতে তোর আর জায়গা নেই। তোদের পাড়া-প্রতিবেশী কোন হিন্দু আর তোদের, সাহুদের ঘরে জলস্পর্শ করবে? তুই আমার ঘরে পনের দিন হয়ে গেল কাটিয়ে দিয়েছিস।'

'কিন্তু আমি তো কেবল তোর ঘরের অন্নজল ছাড়া আর কিছু মুখে দিই নি, আমি···' পূরো আর কিছু বলতে পারল না, কিন্তু পূরো যা বলতে চাইছিল তা রশীদ বুঝতে পারল।

'তোর এই সব কথা কে মেনে নেবে বল! এটা তো আমারই ভদ্রতা, সৌজন্য যে প্রথমে তোর সঙ্গে আমি বিবাহে বসব···' রশীদ ভারী কোমল দৃষ্টিতে পূরোর দিকে তাকাল।

পূরোর চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর ভাবী স্বামীর চেহারা। এ সময় তো পূরোর অঙ্গে তেল হলুদ মাখবার কথা, মাতৃস্থানীয়াদের বন্দনা করার কথা, হলুদ বেটে তাই দিয়ে ছোট ছোট পুআ (মূর্তি) গড়ার কথা এখন পূরোর, সত্যিকার হাতীর দাঁতে তৈরী লাল মুকুট তৈরী করা, কড়ি দিয়ে লাল শালুতে মুড়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি তৈরী করার কথা এখন পূরোর, তারপর পূরোকে রেশমী জোড় পরে সাজতে বসতে হবে, পূরোর সারা সঙ্গে হলুদ মাখিয়ে শুদ্ধ, সুন্দর করে করে তুলতে হবে তাকে, পূরো তারপর সেজেগুজে ডুলিতে গিয়ে বসবে, তারপর পূরো···পূরো···পূরো···।

পূরো তো নির্দোষ! ও কি করে বুঝবে যে ওর নিজের মায়ের মনটাই পাথর হয়ে যাবে, ওর বাবার বুকটা হয়ে যাবে লোহার, তারা নিজেদের আদরের কন্যাকেই ঘর থেকে বার করে দেবে, তাদের ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত ওকে আড়াল করে রাখতে চাইবে না!

'আমি যখন ফিরে আর ঘরে পৌঁছতে পারলাম না তো সেই সময় মা-বাবার কি অবস্থা হয়েছিল কে জানে! আমার বোনটা···!' পূরোর মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা যখন

হোনী ওর বুকের ওপর ভেঙ্গে পড়েছিল।

'তারা কেঁদেছেন, ছটফট করেছেন, ঠিক যে রকম ভাবে আমার ঠাকুর্দা, আমার বাবা, আমার চাচা, আমার পিসীকে নিয়ে যাবার পর কেঁদেছিলেন। পুলিশ অনেক খোঁজ খবর নেবার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে, তারা কোনই পাত্তা করতে পারেনি। আর তারা খোঁজ পাবেই বা কি করে! পুলিশ তো পুরো পাঁচশ' টাকা খেয়েছে।' রশীদ না হেসে পারল না। 'তুমি জানই যে এখন আমাদের সময় বেশ ভালই চলছে। সমস্ত গ্রামটাই এখন মুসলমানদের তাঁবে। কোন হিন্দুর বাচ্চা এখন আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাবে না। এটাই তো অনেক তাদের জান-মান এখনও পর্যন্ত অটুটই আছে। তাদের এখন জীবনের প্রতি বড্ড মায়া। কিচ্ছু বলার মত তাকৃত তাদের নেই এখন। যদি তারা একবার আমাদের বাড়ীর দিকে আঙুল তুলেও দেখাতো তো আমাদের লোকেরা তাদের খালের পাড়েও আসতে দিন না।' রশীদ হেসে হেসেই বলল, বোধহয় ওর বুকের মধ্যেও পুরোনো প্রতিশোধের আগুন লকলকিয়ে উঠছিল।

রশীদের মুখের দিকে তাকিয়ে পুরোর ঘৃণা হলো। ওর জন্মটাই বৃথা হয়ে গেল! ইহলোক তো গেলই, পরলোকও গেল। বোধহয় ওর মা বাবা দেবী ছত্তোয়ানীর কাছে কন্যাকে বলি দিয়ে এতদিনে আবার সিয়ামেই ফিরে চলে গেছে!

'আমার মা বাবা কি তাহলে সিয়ামে চলে গেছে?' পুরো কিছুটা বা উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'না, এখনও যায় নি।' রশীদ উত্তর দিল।

'আমি এখন কোথায় আছি? গ্রাম থেকে কত দূরে?' পুরো সেই স্বরেই প্রশ্ন করল।

'তুই এখন তোদের গ্রামের পেছন দিকের মাথোকিয়াঁর কূয়ার পারে আমাদের নিজেদের বাগান বাড়ীতে রয়েছিস। তবে, হয় তো তুই এখন তোদের গাঁয়ে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছিস। এখন নয়।

উত্তেজনা একটু কমুক, মাস ছয়েক যাক, নিয়ে যাব তোকে ওখানে।' রশীদ মুচকি হাসি হাসতে হাসতে বলল।

পূরো চুপ করে গেল। রশীদ একটি তস্তরিতে পোলাউ ঢেলে পূরোর সামনে ধরে ছিল। রশীদ যখন বাইরে যেতো তখনই বোধহয় কারো সাহায্যে গ্রাম থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসত। পূরো কিছুই জানতে পারতো না।

সেদিন পূরোর মনের ভেতরে ভীষণ তোলপাড় হচ্ছিল। ওর ভয় হচ্ছিল যে ও শেষ পর্যন্ত সাহস না হারিয়ে ফেলে। সে জন্যেই ও পোলাউ খেলো দু'চার গ্রাম। তারপর ঢক্‌ঢক্ করে অনেক জল খেয়ে নিল।

সেই রাত্রে যত সাহস ওর ছিল সবটুকু একত্র করে মনকে দৃঢ় করল। রশীদের শিয়রেই দরজার চাবি রাখা ছিল। পূরো নিঃশব্দে সেটি উঠিয়ে নিল। দরজা খুলে ফেলল। ওর বুকের ভেতরটি ধক্‌ধক্ করছিল। এই বুঝি রশীদ জেগে ওঠে, জেগে উঠল বুঝি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য যাই হোক, রশীদের চোখ খুলল না।

বাইরে রাতের অসীম নৈঃশব্দ ওর বুকের ভেতরটা ফের কাঁপিয়ে দিল। একবার মনে হলো যে ফিরে যায় ও রশীদের কাছে। না জানি রাতের আঁধারে ও ছত্তোয়ানীতে ফিরে যাবার রাস্তা খুঁজে পায় কি না পায়। তা ছাড়া, রাতের এই অন্ধকারে রশীদের চেয়েও কোন খারাপ বদমাইশের খপ্পরে গিয়ে পড়ে কি না। তখন ওর কি দশা হবে তাহলে! কিন্তু তখনই পূরোর মায়ের মুখটি মনে পড়ে গেল। বাবার মুখটি ভেসে উঠল, ভাই-বোনদের কথা মনে পড়ে গেল। পূরো সেই ঘোরের মধ্যেই পাকদণ্ডী ধরে চলতে আরম্ভ করল। হয় তো এটাই মাধোকিয়ার কূয়ার পাড়ের রাস্তা। ভয়ে কাঁপতে ও চলতে লাগল।

রাতের গভীর অন্ধকার ক্রমশঃ সয়ে আসছিল। মাধোকিয়া কূয়ার রাস্তা ঠিকই চেনা যাচ্ছে! পূরো এই ঘুরঘুট্টে অন্ধকারেই

ছত্তোয়ানী গাঁয়ের পেছন দিকের পথ ঠিক চিতে নিতে পারল।

পূরোর অবস্থান এখন না এদিক না ওদিকে। ও ওর শেষ শক্তিটুকু পা ছুটিতে নিবদ্ধ করে নিল। তারপর দৌড়তে লাগল।

পূরো নিজের গ্রাম ছত্তোয়ানীকে চিনে ছিল, ওদের বাড়ীর দিকে মোড় খেয়ে যে গলিপথ, সেটাও চিনতে পারল, অন্ধকারেই নিজেদের বাড়ীর দেয়ালগুলোকেও চিনতে পারল।

পূরো দরজায় ঘট্‌খট্‌ করে শব্দ করলো। যেইমাত্র কেউ ভেতর থেকে দরজা খুলল, পূরো দরজায় গোড়াতেই মেঝের ওপর হুম্‌কি খেয়ে পড়ে গেল। শরীরের শেষ শক্তিটুকুও একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছলো ওর। এবার দৌড়তে দৌড়তে, হাঁফাতে হাঁফতে বুড়ি ছুঁয়েছে। এবার আর সত্যি সত্যিই ওর শক্তির কণাটুকুও অবশিষ্ঠ নেই।

পূরোর দুচোখে আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। ও দেখল, ওর মা, ওর বাবা. হাতে প্রদীপ নিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ও আহত এক পাখীর মত দরজার গোড়ায় কাঁচা মেঝের ওপর পড়ে থেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ও দেখল, মায়ের দু' চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। মা পূরোকে উঠিয়ে দু'হাতে তুলে নিল। পূরো মায়ের বুকের মধ্যে এমন ভাবে নিজের মুখ চেপে ধরল, যেন ভেঙ্গে যাওয়া সম্বন্ধ আবার জোড়া লেগে যাবে। পূরোর মার মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

'লোকজন এসে পড়বে।' পূরোর বাবা স্ত্রীর কাঁধে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল। পূরোর মা কাপড়ের আঁচল নিজের মুখে গুঁজে দিয়েও চাপা স্বরে গোঙাতে লাগল।

'তোর ভাগ্য রে বেটি! এখন আর আমাদেব কিছুই করবার নেই।' পূরো ওর বাবার গলা শুনতে পেলো। ও মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে রইল।

'এক্ষুনি সেখেদের সব লোকজন এসে পড়বে আর আমাদের বাকি বচ্চো-কাচ্চা গুলোকেও শেষ করে দেবে।'

'আমাকে নিয়ে সিয়াম চলে চলো।' পূরো মায়ের বুক থেকে ঈষৎ মুখ তুলে সাগ্রহে নিবেদন করল।

'কোথায় রাখব তোকে আমরা? কে তোকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে? তোর ধর্ম গেছে, তোর জন্মও বৃথা হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা সামান্যও মুখ খুলি তো আমাদের শরীরের এক ফোঁটা রক্তও আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

'হায়! তাহলে নিজের হাতেই আমাকে মেরে ফেলো!' পূরো ছট্‌ফট্‌ করে উঠে বলল।

'বেটা! জন্মের সময়ই যদি মরে যেতি! এবার চলে যা এখান থেকে। সেখ হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে। তোর বাবা, তোর ভাইয়ের আর কোন চিহ্নও থাকবে না। ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।'

মা, না জানি কি ভাবে নিজের বুকে পাথর বেঁধে কথা-গুলো বলে ফেলল।

পূরোর তখন মনে পড়ল, রশীদ বলেছিল, 'ওরে ভালমেয়ে। আর তোদের ওই ঘরে তোর কোন জায়গা হবে না।'

রশীদ কি তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল?

পূরোর ক্ষণেকের জন্য ওর বাগদত্ত স্বামী রামচন্দ্রের কথা মনে পড়ল। পাকা দেখাই বা কি আর বিবাহই বা কি? পূরো কি তাহলে তার কেউই না আর? সে কি পূরোর কথা একবার জানতেও চায় নি?

পূরোর এই মুহূর্তে আর বাঁচতে ইচ্ছা করল না। ও ভাবল, আর সব রাস্তাই তো বন্ধ হয়ে গেছে, বুঝি মৃত্যুর রাস্তাটাই এখনও খোলা আছে। পূরো উঠে বাহিরের দিকে চলতে আরম্ভ করল।

মা-ও বাধা দিল না। পূরো চলতেই লাগল। আসবার সময় ওর জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্খা ছিল, ওর বুকের মধ্যে ছিল, লোভ, বাঁচার লোভ, মা-বাবার সঙ্গে মিলন সুখের স্পৃহা। ভীষণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ও এসেছিল। এখন ফেরবার সময় ও

মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলল। এখন আর ওর মনে কোন ভয় নেই, কোন শঙ্কা নেই। মৃত্যু ছাড়া আর কে—কেই বা কি করতে পারে ওর।

পূরো নিঃশঙ্ক হয়ে মার্ধোকিয়া কূয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রভাতের নতুন আলো সব পথ পাকদণ্ডীগুলোর ওপর ছড়িয়ে পড়ছে।

সামনে থেকে রশীদ দ্রুত পায়ে পথ ধরে আসছিল। পূরোর পা সেখানেই থেমে গেল। মৃত্যুও তাহলে পূরোর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

পূরোর মনে হচ্ছিল গত পনের দিনে ওর শরীরের সমস্ত মাংস খসে পড়ে গেছে। এখন ও একটা নিরাবরণ কঙ্কাল মাত্র। না আছে ওর কোন আকৃতি, না রূপ বা কোন মন বা মর্জি। রশীদ এসে পূরোর হাত ধরে ফেলল। ও তার সঙ্গে চলতে লাগল।

তৃতীয় দিন এক মৌলবী এল। দু'তিন জন লোকও এল। তারা সবাই রশীদের সঙ্গে পূরোর নিকাহ্ দিয়ে দিল। তারপর নিজে থেকেই রশীদ ওকে বলল যে পূরোর বাবা-মা ভালমতই সিয়াম চলে গেছে।

ছত্তোয়াণীর নাম মনে এলেই এখন পূরোর মাথাটায় পাক দিয়ে ওঠে। রশীদ বুঝতে পারতো। তা ছাড়া, পূরোকে ছত্তোয়ানীতে নিয়ে গেলে বিপদ ঘটতে পারতো। বোধহয় রশীদের মনে ভয় ছিল যে হয়তো ওখানকার বা আশেপাশের গাঁয়ের হিন্দুরা ওদের দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। যদিও আজ প্রায় মাসখানেক হতে চলল কেউ কোথাও একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি। আসলে অন্যের জ্বালানো আগুনে কে আর সাধ করে ঝাঁপ দিতে চায়? এ তো শত বছরের পুরানো বিরোধ। কেউ হয়তো মনের মধ্যেই চেপে রেখেছে, অন্যজন তা প্রকাশ করে ফেলেছে।

রশীদের মা বা কোন ভগ্নীই সে সময় জীবিত নয়। ভাই ছিল, চাচা ছিল। রশীদ পূরোকে বলল যে সে ওকে এখান থেকে কয়েক

ক্রোশ দূরে তাদের এক চেনা গ্রাম সক্কড়আলীতে নিয়ে যাবে। সেখানে তার জ্ঞাতি আত্মীয়রা থাকে। রহিম বলে এক আত্মীয়ের জমি জমা আছে। এখানকার এই জমির সঙ্গে যদি বদল করে ওখানে জমি পাওয়া যায়।

এখন পূরো ভবিতব্যের সব ধাক্কা সইবার জন্য তৈরী। যখন নিজের বাবা-মা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, তখন এই গাঁয়ে আর কি রইল ওর। এখানে না হোক্ ওখানেই সই!

রশীদ নিজেই একদিন দু-তিনটে ট্রাক নিয়ে এল। আরও কিছু জিনিষপত্রও আনলো। তারপর পূরো সঙ্গে করে সক্কড়আলী গাঁয়ের দিকে চলল। চোখ বুঁজে যদি পথ চলা যায়, তেমনিভাবেই পূরো রশীদের সঙ্গে নতুন গাঁয়ে এসে পড়ল। নতুন গাঁয়ে পৌঁছেই একটা আলাদা বাড়ী পাওয়া গেল। বোধহয় রশীদ আগে থেকেই রহিমকে জানিয়ে বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। রহিমের বাড়ী সেখান থেকে অনেকটা দূরে।

তবু রহিমের বাড়ীর মেয়ে, স্ত্রীরা ওর সঙ্গে দেখা করতে এল। এই প্রথমবার যখন রশীদের আত্মজনেদের মধ্যে মেয়ে স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা হলো।

পূরো তো একেবারে হারিয়ে যাওয়া বাছুরের মত দিশাহারা হয়ে চুপ করে বসে রইল। খুব বেশী কথাবার্তা অবশ্য বলল না কেউ পূরোর সঙ্গে। ঘর-সংসার বিষয়ে ছোটখাট প্রশ্নই কেবল করল।

রশীদ পূরোকে পূরো বলেই ডাকত। নিকাহ্‌র সময় অবশ্য পূরোর নাম হামিদা রাখা হয়েছিল। এখনও অবশ্য সে নামে রশীদ কখনও ডাকে নি।

একদিন হঠাৎই রশীদ একটা লোককে নিয়ে এলো বাড়ীতে। সে স্ত্রী-পুরুষদের হাতে নাম লিখে দেয় ব্যাটারিচালিত কলম দিয়ে। সেদিন পূরোর বুকের ভেতরটা ফের ছট্‌ফট্ করে উঠেছিল। কিন্তু রশীদ যেই বলল ও হাত বাড়িয়ে ধরল। আর ওর হাতে 'হামিদা'

নামটা গভীর সবুজ রঙে চিরদিনের মত লেখা হয়ে গেল। সেদিন থেকেই রশীদ ওকে হামিদা বলেই ডাকতে লাগল। বোধহয় পরামর্শটা রহিমের বাড়ীর স্ত্রীরাই দিয়েছিল।

পূরো এবার হামিদা হয়ে গেল। কিন্তু এখনও যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, ওর স্বপ্নে ওর সখী-বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হয়, স্বপ্নের মধ্যেই ও ওর মা-বাবার ঘরেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করে, সবাই ওকে পূরো বলেই ডাকে।···দিনের বেলা পূরো হামিদা হয়ে যায়, রাতের অন্ধকারে পূরোই থেকে যায়। কিন্তু পূরো ভাবত, ও বাস্তবে হামিদা ছিল না পূরো, আসলে ও একটা কঙ্কাল, যার না আছে রূপ না আছে কোন নাম।

পাঁচ ছ'মাস হয়তো কেটেছে, পূরোর কঙ্কালের খাঁচার মধ্যে একটা ছোট্ট নরম তুলতুলে জীবন নাচানাচি করতে লাগল।

বৈশাখের মেলা

মেঘলা মেঘলা দিন। অতীতের এক একটা দিন একে একে পূরোর চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। চটের একটা টুকরো নিজের পায়ের নীচে রেখে ও পাথরের মূর্তির মত সব দেখতে লাগল।

বাইরের দরজা খুলে রশীদ ভেতরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পূরো যেন দরজা খোলার শব্দ শুনতেই পায়নি, যেন ও কারো আসাও দেখতে পায় নি। ও বসে রইল, তো বসেই রইলো। রশীদের বুঝি সত্যি সত্যি পূরোর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। ও চুপটি করে এসে পূরোর পাশটিতে বসে পড়ল।

'কি ভাবছিস?' রশীদ এক হাতে পূরোর শরীরে বেড় দিয়ে ধরল। পূরো আজ খুবই উদাস; ও নড়লও না বা কিছু বললও না।

রশীদ ওকে আদর করতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে পূরো বলল, 'আজ আমার এমন মনে হচ্ছে যেন কেউ আমার শরীরের

ভেতর নাড়ীভুড়িগুলো খামচে ছিঁড়ে ফেলছে।'

রশীদ হাসতে লাগল আর ওর মনটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর উঠে উনুনের বুঁজে যাওয়া আগুন ফের ধরালো। তারপর পূরোকে পাশে বসিয়ে একটা হাঁড়িতে বটের পাখীটা সিদ্ধ বসিয়ে দিল।

'তুই তো কোথাও যাস না, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলা মেলামেলা করিস্ না। এতে তো সুস্থলোকেরই মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।' রশীদ থেমে থেমে কথাগুলো বলল।

'কোথায় যাব? আমার আর যাবার জায়গা কোথায়?' পূরো স্তিমিত স্বরে বলল।

'এখন তুই এই সংসারের মাল্‌কিন্; আর কদিন পর তোর এই উঠোনে একটা নতুন জীবন খেলা করতে থাকবে। আমার জন্যে না হোক, ওই জীবনটার জন্যেও তোর মনকে ছোট করে রাখা ঠিক নয়। সে বেচারা তো তোর কোন ক্ষতি করে নি।' রশীদের আগত সন্তানের কথা মনে পড়ে গেল। তার দোহাই দিয়েই পূরোকে বোঝাতে চাইল সে।

পূরোর আবার সেই মটরশুঁটি থেকে বেরুনো পোকাটার কথা মনে পড়ে গেল, যেটা দেখেই ওর শরীর ঘুলিয়ে উঠেছিল, যেটার সঙ্গে বাকী মটরগুলোকেও ওর ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

'রান্নার মশলার সঙ্গে কয়েকটা মটরদানাও দিতে হবে।' রশীদ পূরোর সামনে ছড়ানো মটরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল।

'মটর সব পেকে গেছে। এখন আর মটরে তো কোন স্বাদ নেই। বৈশাখ মাস পড়ে গেছে।' পূরো জানতো যে আজ ও মটরদানা দাঁতেও কাটতে পারবে না।

'হুঁ! সত্যিই। কালকে তো বৈশাখীর বড় মেলা সুরু হয়ে যাবে।' রশীদ সহজ স্বরেই বলল।

বৈশাখী···বৈশাখী···পূরোর কানে গুঞ্জন তুললো। ও পরাতের মধ্যে দুতিন মুঠি আটা নিয়ে দলতে আরম্ভ করল, যাতে ওর মন

অন্য দিকে ঘুরে যায়।

'আজ খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার জানো যে গুড় দিয়ে আপেল দিয়ে ক্ষীর তৈরী করা যায় কিনা।' রশীদ বলল। পূরো নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ভেতর থেকে আপেল আর গুড় এনে দিল।

সেই ক্ষণেই পূরো অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল। একদিন পূরোর মা বসে সুজিদানা ভাঙ্গছিল তো পূরো বলল, 'মা, ও মা, আমার না কলে ভাঙ্গা সূজি খেতে খুব ইচ্ছে করছে।' শুনে মা সঙ্গে সঙ্গে বকুনি দিয়ে বলছিল, 'ওসব মুসলমানেরা খায়।'

কথাগুলো মনে হতেই প্রথমে তো দুচোখ ভরে উঠল জলে, কিন্তু পরক্ষণেই ও হেসে উঠল।

রশীদ ওর হাসির কারণ কি জিজ্ঞেস করতেই পূরো কথাগুলো তাকে শুনিয়ে দিল। শোনাতে শোনাতেই ও ফের কেঁদে ফেলল। রশীদ লজ্জিত হয়ে অপ্রতিভের হাসি হাসতে লাগল।

দ্বিতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনতে পেলো পূরো বৈশাখী উৎসবের ঢোল বাজছে। প্রথম দিকটা ঘরের কাজকর্মগুলি সারতেই হলো পূরোকে। তারপর ছাদে উঠে দূরের গাঁয়ের বৈশাখীর মেলার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

দূরে এক বিশাল জনতার চেহারাই দেখতে পেল ও। লম্বা-চওড়া চেহারার জাঠেরা কোমরবন্ধে ছুরি বেঁধে, হাতে তেল চুকচুকে লাঠি নিয়ে, আর বুকভরা উৎসাহ আর উল্লাস নিয়ে মেলার এদিক থেকে ওদিকে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই ঘোড়ায় চড়ে আসছে। পেছনে স্ত্রী আর সামনে ছেলেপুলে কাউকে বসিয়ে টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করে দুল্‌কি চালে চলছে ঘোড়াগুলো। ওদিকে বেশ কতক বলিষ্ঠ নবযুবকের দল নিজেদের যৌবন আর শক্তির অহঙ্কারে ভরপুর চওড়া বুকের ছাতি উঁচিয়ে চলেছে, কেউ গান গাইতে গাইতে, কেউ কেউ বা কথা বলতে বলতে। আরো দূরের মেলা প্রাঙ্গনের কোথাও হয়তো বসেছে কুস্তির আসর; জিলিপি ভেজে ভেজে মস্ত বড় থালার ওপর রেখে দেওয়া

হয়েছে; গরম গরম পকোরা ভাজার সুগন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে। গুড়ের রসে ডোবানো মালপোয়া, চিনির রসে ডোবানো ময়দার মিষ্টি মুঠি আর স্তুপাকৃতি মণ্ডা-মিঠাই অনেক বড়, লম্বাচওড়া লোহার কড়াই ভর্তি সব সাজানো হয়েছে।

পূরোর মস্তিষ্কের মধ্যে হঠাৎ একটি চিন্তা জাগল, যেন কেউ একটি হাতুড়ি দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করেছে। ওর মা তিন মেয়ের পর এবার পুত্র সন্তানকে জন্ম দিয়েছে, আর তার······এইটাই সেই ভাইয়ের জীবনে প্রথম বৈশাখীর উৎসব!

পূরো দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার ছাতেই বসে পড়ল। কে জানে হয়তো এখন ওর মা ওর ছোট্ট ভাইটির মুখের ভাতের বন্দোবস্ত করছে কিনা। তার আগে মুখে জল দিতে হয়। পাশের কোন বহতা নদীর জল নিয়ে গোলাপফুল সেই জলে ভিজিয়ে, ওর ভাইয়ের ছোট্ট মুখে এক ফোঁটা দু'ফোঁটা ঢেলে দিয়েছে হয়তো মা। তারপর প্রতিবেশী এয়োস্ত্রী-রা ওর মাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারপর কে জানে······কে জানে এখন, এই মুহূর্তে, ওর মা তার পেটেরই সন্তান পূরোর কথা মনে করে ······

পূরোর চোখের জলও বারে বারে আসা যাওয়া করতে করতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইলো।

একদল জাঠ যুবক কানে ফুল গুঁজে হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ বেশ জোরেই গাইছিল:

খুহ্ তে বৈঠি দাতন করদী
চিড়িয়াঁ দন্দা দী মারী
নীঁ আপে তৈনুঁ লই জানগে
জিন্হাঁ নুঁ লগে পিয়ারী
নী আপে তৈনুঁ লই জানগে······

'আহ্! যদি কেউ পেয়ারী দুঃখী কন্যার ব্যথাটুকু বুঝতো।' পূরোর মুখ দিয়ে স্বতঃই কথাগুলো বেরিয়ে এল।

তখন পূরোর মনে হলো, ওকে রশীদেরই পেয়ারী বলে মনে হয়েছিল, তাই সে ওকে নিয়ে এল। তো ওকে ওর বাগদত্ত রামচন্দ্রের পেয়ারী বলে মনে হলো না কেন? সে তো ওর কথা একবার জানতেও এল না। পূরো তো রামচন্দ্রেরই পেয়ারী হতে চেয়েছিল। রশীদকে ও নিজে তো কখনই চায় নি বা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি বা ওর মা বাবাও রশীদকে নিয়ে কখনও ভাবে নি! তবে?

জাঠ যুবকের দল হাসছিল প্রাণ খুলে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ভাঙ্গরা নাচ নাচতে নাচতে যাচ্ছিল আর গান গাইছিল ঃ

তেরে লোঁগ দা বজ্জা লিশকারা
হাল্দিয়াঁ নুঁ হল ভুল্ল গয়ে···
তেরা ভিজ্জয়া পরী দা লহঙ্গা
পচ্ছো দিয়াঁ গৈণ কনিয়াঁ···
সান্নুঁ কণ্ড না দেই মুটিয়ারে
নী রাহে রাহে জান বালীয়ে······

পূরো ভাবতে লাগল, সব গীতই সুন্দরী মেয়েদের গুন গায়, সমস্ত ভজন গানই সত্যি প্রেমরই বর্ণনা করে। কখনও কি এমন গীত রচিত হবে যাতে আমার মত মেয়েদের কান্নার কথা বর্ণিত হবে? কখনও কি এমন ভজন গান কেউ লিখবে যাতে ভগবান বলেই কেউ থাকবে না?

উদ্ভিন্ন যৌবনা একদল নবযুবতী যৌবনের স্বাভাবিক অত্যুৎসাহে ডগমগ হয়ে আলাদাভাবে মেলার দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছুটা দূরে থেকে জাঠ যুবকের দল বারে বারে যুবতীদলের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল আর হা হা করে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছিল। পূরো ভাবছিল। যদি সব কজন যুবতী মেয়েকে এই সব ছেলেরা সকলে মিলে নিজের নিজের ঘোড়াতে এক একজনকে বসিয়ে তুলে নিয়ে যায়, তারপর কি হবে? যদি সত্যি সব মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়······

পূরোর সন্তান

ভীষণ গ্রীষ্মের দাবদাহ সুরু হয়ে গেছে। লকড়ি দিয়ে উনুন জ্বালানোর মত প্রচণ্ড তাপে জ্বলছে ধরিত্রী।

পূরো কখনও বসে, কখনও উঠে দাঁড়ায়, কখনও শুয়ে থাকে। আজ ওর শরীরে ভাল নেই। বারে বারে কেবল ও জল খাচ্ছিলো। ওর এক প্রতিবেশিনী ওকে বলেছিল, 'যে ভাবেই হোক আজ স্নান কর, মাথা ধুয়ে নাও, কে জানে রাতে বা ভোরবেলাই তোমার ঘরেই কিছু হয়ে যায় কিনা ; তাহলে তো বেশ কটা দিন তুমি আর উঠে বসতেও পারবে না।'

রশীদ দেখল, পূরোর গায়ের রঙ শরীরে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন তুলোর মত সাদা হয়ে যাচ্ছে। রশীদের মনে পড়ে গেল সেই সময়টার কথা যখন সে ছত্তোয়ানীর কাঁচা সড়ক থেকে পূরোকে ঘোড়ার সামনে বসিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো। সেই সময়ও পূরোর শরীরের সমস্ত রঙ যেন ফিটকিরির মত সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সেই সময় পূরোর আত্মার ভেতর ক্ষরণ হচ্ছিলো ; আর আজ আবার সেই ক্ষরণ হচ্ছে ওর শরীরের রক্ত মাংস থেকে।

রশীদ তার ক্ষেতের কাজ করে একটা চাকরকে রহিমের বাড়িতে পাঠালো। পূরোকে একা এই বাড়ীতে রেখে ওর যেতে সাহস হচ্ছিলো না। যখন রহিমের মা এসে পৌঁছল এ বাড়ীতে তখন পূরোর অসুস্থতা বেড়ে সমস্ত রক্ত যেন ওর মুখে এসে জড়ো হয়েছে। আসার সময় রহিমের মা তাদের পাশের গলির বাড়ী থেকে সেই দাই-মা কেও সঙ্গে এনেছিল, যে রহিমের দুই বউয়ের দু-দুটো তিন-তিনটে ছেলে-মেয়েদের জন্মের সময় সাহায্য করেছিল।

দাই এসেই মেঝেতে পুরোনো একটা কাঁথা পেতে তার উপর পূরোকে শুইয়ে দিল। পূরো দড়ির নরম খাট থেকে মেঝেয় শুয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

রশীদ বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধ দরজা ঘরের ভেতর থেকে পূরোর দাঁতচাপা আর্তধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল রশীদ। তার মনে হচ্ছিল যদি পূরোর যন্ত্রনার অন্ততঃ অর্ধেক ভাগও সে নিজের শরীরে গ্রহণ করে নিতে পারতো। পূরো একাকী পড়ে যন্ত্রনায় কাতরাতে লাগল।

দাই পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে পূরোর মুখে বাতাস করতে লাগল। বারবার রহিমের মা অল্প অল্প জল পূরোর দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিতে লাগল।

বাইরে দাঁড়ানো রশীদ তিনবার পূরোর প্রাণঘাতি চিৎকারের পর শিশুর ট্যাঁ ট্যা কান্নার শব্দ শুনতে পেলো। তারপর পূরোর মুখ দিয়ে আর কোন শব্দ বেরুল না। ওর সব কষ্ট বুঝি শেষ হলো। রশীদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ঘরের ভেতর যেতে। দাই হয়তো বাচ্চাটির তদ্‌বির তদারকেই ব্যস্ত; সে গিয়ে পূরোকে দেখা শোনা করতে পারে। পূরো তো এ যাবৎ ওর হাতে পড়ে কেবল কেঁদেই গেল, আবার শিশুটির কারণে কত না যন্ত্রনা পেয়ে কাত্‌রালো। এখন একবার—। কিন্তু ভিতরে ওর চাচী বসে আছে, দাই-মা বসে আছে। যতক্ষণ তারা তাকে ভেতরে না ডেকে নিচ্ছে তার আগে ভেতরে যাওয়াটা তার নিজের কাছেই অভদ্রতা বলে মনে হচ্ছিলো।

মিনিটের পর মিনিট চলে গেল, পূরোর গলার আওয়াজ শোনাই গেল না। রশীদের বুকের ভেতরটি হঠাৎ ধ্বক্‌ করে উঠল—পূরো বেঁচে আছে তো? তবে ওর গলার কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না কেন?

এই ভাবে আধ ঘন্টা কেটে গেল। দাই বাইরে এসে বলল, 'বেটা! আনন্দ করো! তোমার একটি ছেলে হয়েছে।'

'ওর অবস্থা কেমন?' রশীদ জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক আছে, বেটা! এমনিতেই তো এ সময় দুর্বল হয়ে পড়ে সকলেই। ছেলে তো আর ছাত থেকে পড়ে না।' দাই একটু ঢঙ্‌ করে হেসে বলল। এ হচ্ছে দাইদের সেই ঠোঁট বেকানো মুচ্‌কি

হাসির ঢঙ যা এরা, এই দাঈয়েরা. শতশত প্রসূতিকে প্রসব করানোর গর্বে স্ফীত হয়ে স্বামী বেচারীদের নিয়ে ঠাট্টা করে।

রশীদ যখন ভেতরে যাবার অনুমতি পেলো তো গিয়ে দেখল পূরো শুয়ে আছে। ওর দু'চোখ কেমন স্তিমিত, উদাস। ওর পাশেই সাদা কাপড় জড়ানো ওর আর রশীদের পুত্র শুয়ে শুয়ে বুড়ো আঙ্গুল চুষছে।

রশীদের বুকটা গর্বে ভরে উঠল। পূরোকে সে, পুরোপুরি নিজের করে পেয়ে গেছে, এই জুয়াতে পূরোকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করাই ওর আসল পাওনা। পূরো এখন আর কেবল ওর ভাগিয়ে নিয়ে আসা রক্ষিতা নয়, ও এখন কেবল আর ঘরে এনে ফেলা একটা মেয়েমানুষই নয়, এখন পূরো তার সন্তানে জননীও বটে।

রহিমের মায়ের কথা শুনে রশীদ নিজ পুত্রের উদ্দেশ্যে এক টাকার মিষ্টি মানত করল। পূরো নিদ্রালু চোখ দুটো খুলল। রশীদের দিকে দেখল একবার চেয়ে।

'আর তুই আমাকে কি বলতে চাস? আমি তোকে তো সব দিয়েছি, তোকে একটা পুত্র সন্তানও দিয়েছি। এখন আর আমার কি আছে দেবার মত?' কথাগুলো যেন পূরোর মূক জিহবাতে মুখর হয়ে উঠল। ও ক্লান্ত চোখ দুটি বুঁজে অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

গরম করা গুড় আর বাদাম পেষা মেশানো কয়েক চামচ খাবার পর পূরোর শরীরে যখন একটু বল সঞ্চার হলো তো ও দেখল যে ওর বাচ্চাটার নরম-নরম মুখ ওর বাহুতে লাগছে। পূরোর শরীরে কেমন একটা কাঁপন জাগল। মনে হলো যেন একটা নরম, সাদা পোকা ওর গা বেয়ে বেয়ে উঠছে। শরীরের মধ্যে ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল ওর। ইচ্ছে হলো, নিজের হাতে চেপে ধরে পোকাটাকে চেপ্টে মারে, কি নিজের শরীরের কাছ থেকে দূরে ছিটকে ফেলে দেয়, ঠিক যেমন নখের সহায্যে শরীরে ফুটে যাওয়া কাঁটাটাকে বার করে মানুষ দূরে ফেলে দেয়, কি হাতে বা পায়ে গুঁপোকড়া পড়ে গেলে সেই নির্জীব মাংস পিণ্ডটাকে কেটে দূরে ফেলে দেয় কিংবা এঁটুলি পোকাকে শরীর

থেকে থামচে ধরে আলাদা করে ফেলতে হয় বা শরীরে জোঁক ধরলে সেটাকে যেমন উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়……

রহীমের মা তেরোদিন থাকবে এ বাড়িতে। পুরোর ছেলে হয়েছে আজ নিয়ে চারদিন হলো।

পাঁচ দিনের দিন পুরোর বুক ভরে দুধ এলো। এতদিন দাঈ তুলো দিয়ে সলতে পাকিয়ে পাকিয়ে তার সাহায্যে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। আজ সে বাচ্চাটার মুখ পুরোর পুষ্ট দুধেল স্তনে ধরিয়ে দিল।

ছেলেটা পুরোর কোলে পড়ে রইল। ওর শরীরের সঙ্গে চেপ্টে। পুরো ওর শরীরের অভ্যন্তরের নাড়ি গুলিতে কেমন একধরনের খিঁচ্ অনুভব করল। মনে হলো ওর বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে প্রাণভরে কাঁদে। ছেলেটা ওর নিজের রক্ত দিয়ে তৈরী খেলনার মত, ওরই মাংস দিয়ে বানানো পুতুল। এই ভরন্ত পুরন্ত সংসারে এই ছেলেটাই ওর একমাত্র আপনজন। ও তো আর কখনো নিজের মায়ের মুখ দেখতে পাবে না, ও আর কোনদিন ওর বাবার মুখও দেখবে না, ও কখনো আর ভাই বোনদেরও দেখতে পাবে না…ও ……ও কেবল ওর ছেলের মুখই দেখবে, যার রক্তে ওর বাবা-মার রক্তও মিশে রয়েছে। ওর মা বাবা ওকে তো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের রক্তকে আর কিভাবে আলাদা করবেন তারা, যা পুরোর অঙ্গে-অঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে, যা ওর এই ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তানের শরীরেও প্রবাহমান্।

বাচ্চা পুরোর বুকের দুধ টেনে টেনে খেতে লাগল। একসময় পুরোর মনে হলো, এই ছেলেটা ওর শিরা-উপশিরা থেকে দুধ টেনে নিচ্ছে—জবরদস্তিভাবে……জবরদস্তি……এর বাপও তো ওর সঙ্গে জবরদস্তি করেছে। ছেলেটাও তো বাপেরই রক্ত বইছে তার শরীরে, বাপেরই মাংস দিয়ে তৈরী, বাপেরই প্রতিরূপ এই ছেলেটাও। জবরদস্তি এসে এই ছেলেটা ওর শরীরে বাসা বেঁধেছে, জবরদস্তি করে ওর পেটের মধ্যেই থেকে পুষ্ট হয়েছে, আর এখনো জবরদস্তি

করেই ওর শরীরের মধ্য থেকে দুধ টেনে টেনে খেয়ে নিচ্ছে······

পূরো হাত দিয়ে নিজের মাথায় স্পর্শ করল একবার। আগুনে তপ্ত ইটের মত ওর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। বোধ হয় জ্বর আসছে ওর শরীরে হু হু করে···পূরোর মস্তিষ্কের কোষে একটা চিন্তার উদয় হলো ; এই ছেলেটা···এই ছেলেটার বাবা······সমস্ত পুরুষ জাত ······পুরুষ······পুরুষ—যারা স্ত্রীর শরীরকে কুকুরের হাড় চোষার মত চোষে,—কুত্তার হাড় চিবানোর মত চিবোয়।

ছেলেটা পূরোর দুধ খেয়ে যাচ্ছে। পূরোর মনটা মাঝ দরিয়ার নৌকোর মত এক একবার জলে ভরে উঠে ডুবতে ডুবতে ফের জল ছেঁচে ফেলে দিয়ে ভেসে উঠছে যেন।

অনাথ

পূরোর গোলগাল নাদুস নুদুস ছেলেটাকে সবাই জাবেদ বলে ডাকতে লাগল। পূরো তাকে দড়ির খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। পা দুটো উঁচিয়ে ছুড়ে সে তার গায়ে ঢাকা চাদরটাকে শেষ পর্যন্ত পায়ের নীচে ফেলে সেটার ওপর দাপড়াতে থাকে। পূরো ছেলের দু'পায়ে চাঁদির মল পরিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা পা দাপড়ায় আর মল বাজতে থাকে ঝম্‌ঝম্‌। পা চালাবার সময় এত জোরে জোরে দাপড়ায় যে বেচারার মুখটা লাল তো হয়ে যায়ই, একটু পরেই হেঁচকি উঠতে থাকে।

তখন পূরো ছেলেটার হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখে। ধবধবে ফর্সা হাত দুটো। হাত দুটো এমন নরম নরম আর পুষ্ট যে পূরোর মনে হয় যেন একেবারে মোম গলিয়ে তৈরী পুতুলের হাতের মত ; যেমনটা ও সেই ছোট্ট বেলায় সিয়াম থেকে ফেরার পথে কলকাতার একটা বাজারে দেখেছিল এবং কিনেও এনেছিল। তারপর, পুতুলটার জন্তে কুরুশ কাঁটা দিয়ে বুনে একটা জামা পরিয়ে দিয়েছিল, এবং ছোট পুঁতির মালা গেঁথে গলায় হাতে পরিয়েছিল। জাবেদের

হাতও ঠিক সেই পুতুলটার হাত দুটোর মত নরম থলথলে। মোমের সেই পুতুলটা বুঝি এখনও ভেঙ্গে যায় নি। পূরো ভাবতে থাকে, কখনও কখনও কাঁচ বা মাটির তৈরী জিনিষের আয়ুও কত লম্বা হয়ে যায়। হয়তো আজ এখনও সেই মোমের পুতুলটা নিয়ে ওর কোন বোন খেলা করছে।

আঁধার থাকতে থাকতেই পূরো ক্ষেতে কাজ করতে চলে যায়। রশীদ তখন ছেলেটার কাছে বসে থাকে। একদিন, আঁধার বয়ে গেছে পূরো তখন ক্ষেত থেকে ফিরছিল। গ্রামের ঠিক বাইরেই মুসলমানদের নিদিষ্ট কূয়া থেকে জল নিয়ে ও হাত-পা ধুয়ে নিল। তারপর যখন ও গাঁয়ের দিকে ফিরছিল, তখন ওদের বাড়ীর কাছেই থাকে কাম্মো নামে যে মেয়েটি, তাকেই যেন দেখল ও।

শরৎকালের হালকা ঠাণ্ডা পড়ছে। কাম্মো জলের কলসটা একটা ছোট পাথরের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পূরো যেমনই তার পাশ দিয়ে চলে গেল তো কাম্মো কাঁপা হাতে ঘড়াটা তুলে নিল। বোধহয় ঘড়ার ভার কাঁধের ওপর রাখতে পারছিল না সে। ঘড়াটা যাতে তার কাঁধের থেকে পড়ে না যায় তাই ঘড়ার নিচে হাত রেখেও সে সামলাতে পারছিল না, দ্বিগুণ ভার মনে হচ্ছিল। ডান হাতে কোনোক্রমে ঘড়াটা সামলাতে সামলাতে কাম্মোর মুখ থেকে স্বতঃই কাতর ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল, 'ওহ্, মা!'

পূরোর চলন্ত পা দুটো থেমে গেল। একেবারে কাম্মোর পাশে এসে দাঁড়াল। ও মনে মনে ভাবল, দশ-বারো বছরের এই মেয়ে কাম্মোর কাঁধ থেকে ঘড়াটা নামিয়ে নেয়। কাম্মো ওর সঙ্গে সঙ্গে চলুক। মেয়েটার খালি পা। সব সময়ই যার খদ্দরের পাজামাটা হাঁটুর ওপর গোটানো থাকে, যার ঢলঢলে গায়ের জীর্ণ জামাটা কখনও কাঁধের এদিক থেকে খসে খসে পড়তে চায়, তার ওপর ছেঁড়া ওড়নাটাও জড়িয়ে জড়িয়ে গিয়ে বেচারা মেয়েটাকে বিব্রত করে, মাথার চুলগুলো কেমন শুকনো শুকনো, তেলহীন উস্‌কো খুস্‌কো ;

মেয়েটাকে এতদিন কেবল দূর থেকেই দেখেছে পুরো। আজও তার পাশে গিয়ে না হয় তার কাঁধ থেকে ঘড়াটা নিয়ে নিক; পিতলের ভারী ঘড়াটা দুর্বল কাঁধের ওপর কেবল ঠক্‌ঠক্‌ করে আঘাত করেই যাচ্ছে।

'বড় দেরী হয়ে গেলো?' ঘড়ার ভারে নত শরীরটা সামলে মেয়েটা যেন পুরোর কাছে দেরী না হবার একটা অজুহাত দেখাতে চাইল।

'এখনও তো বেলা হয় নি।' পুরো স্থির স্বরে বলল।

মেয়েটার মনে বুঝি একটু সাহস জাগল। সে কাঁধের ভার নামিয়ে মাটির ওপর রাখল ফের। ঘড়াটা নামাতে গিয়ে এক ছলক জল পড়ল তার কাঁধের ওপর। ঢোলা জামার ভেতর দিয়ে সেই জল গড়িয়ে গিয়ে কাম্মোর ভেতর শরীরটা ভিজিয়ে দিল। শীতের এক ঝলক কাঁপুনিতে শরীরটা শিউরে উঠল তার।

পুরো দাঁড়িয়ে পড়ল। কাম্মো পুরোর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। এক মুহূর্ত আগে সে দেরী হয়ে যাবার ভয়ে আর ঘড়ার বোঝায় মুষড়ে পড়েছিল। পুরো তো কাম্মোর মুখে সবসময় সেই ভয় ভয় ভাবটিই লক্ষ্য করতো। সব সময়ে তার চওড়া ঠোঁট দুটোতে ছড়ানো হাসির ভাব দেখে দেখে পুরোর মনে হতো মেয়েটা যেন ঠিকতত হাসতেও জানে না, যেন ঠোঁট বেঁকিয়ে কারোর দিকে চেয়ে কেবল ভেংচে যাচ্ছে সে।

'কাম্মো! তুই কি রোজ এইসময় আসিস?' মেয়েটার এই নাম ধরে সবাই ডাকে তাতেই ও নামটা জেনেছিল।

'মনে হচ্ছে আজ কিছুটা দেরীই হয়ে গেছে। মার আছে আজ কপালে।' বলতে বলতে কাম্মো ফের ঘড়াটাতে হাত দিল। দেরী যে হয়েছে, এ কথা বলতে বলতেই ভয়ে কেঁপে উঠল মেয়েটা। তার মুখ থেকে হাসির রেখাটা কাঁচা রঙ ধুয়ে যাবার মত মুছে গেল. ভয়ের ভাবটা আবার জেগে উঠল মুখে।

'কাম্মো! ওরা তোর কে হয়, যাদের সঙ্গে থাকিস?'

'চাচী।' কাম্মো জবাব দিয়ে ঘড়ার নিচে হাত রেখে তুলতে যেতে ওর হাতই যেন বেঁকে যেতে চাইল। কে জানে ঘড়ার ভারে না চাচীর কথা মনে পড়ে।

'তুই যদি চাস্ তো আমি তোর ঘড়াটা নিয়ে নেব?' পূরো বলল বটে মুখে। কিন্তু হাত বাড়ালো না। পূরোর নিজের কথাটা ঠিকই মনেছিল যে লোকেরা জানে ওর নাম হামিদা—হামিদা—রশীদের বউ, আর কাম্মো হিন্দুর মেয়ে।

'ঘড়াটা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।' অসঙ্কোচে বলে দিল কাম্মো।

'জলে তো আর ছোঁয়া লাগবে না। আমি জলে হাতই লাগাবো না। তুই গিয়ে বাইরে থেকে ঘড়াটা মেজে নিবি।' বলতে বলতে পূরো হেসে ফেলল। কাম্মোও হেসে ফেলল। কিন্তু ঘড়াটাও ওঠাতে লাগল।

তুজনে তারপর কিছুটা দূর এগিয়েছে কি না এগিয়েছে কাম্মোর পা মুচ্‌ড়ে গেল। ঢলে পড়া ঘড়াটাকে ধরে ফেলল পূরো, কিন্তু কাম্মো পড়ল গিয়ে কাঁকর-পাথরের ওপর। মচকেই গেল পা বুঝি তার।

পূরো ঘড়াটা রেখে কাম্মোর পা তুটো দেখল। গোড়ালির কাছে পা তুটোতে হাত দিয়ে ডলতে লাগল। খানিক পর কাম্মো উঠে দাঁড়াতে পারল। পূরো ঘড়াটা তুলে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

'ও, মা!' বলে কাম্মো কাঁদতে আরম্ভ করল। পূরোর মনে হল যেন কাম্মো তার সমস্ত তুঃখের বার্তা জানিয়ে তার পরলোক-গামিনী মায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে লাগল।

'জন্ম দিয়েই ফেলে রেখে গেল আমাদের কাছে', পূরো কতবার যে কাম্মোর চাচীর মুখে কথাগুলো শুনেছে। কাম্মোর মা-বাবা কেউই নেই। কাম্মোর বাবা হয়তো জীবিত। শোনা যায় যে সে শহরে অন্য কোন স্ত্রীলোক নিয়ে থাকে। সে না চাইত কখনও কাম্মোর কথা জানতে, না রাখতো মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক।

পূরো ভাবছিল, মা মরে গেলে বাপও পর হয়ে যায়···ভাবতে ভাবতে ওর মনটা নিজেরই জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মা ওর জীবিত, তবুও বাবা পর হয়ে গেল, মাও পর হয়ে যায়···

গ্রাম এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোও বেড়েছে। ওরা মহল্লার গলির মোড়ের কাছেই এসে পড়েছে। তখন দুজনেরই ভয় হল পাছে কেউ পূরোর কাঁধে ঘড়াটা না দেখে ফেলে। কাম্মো যখন কোন মতে ঘড়াটা নিজের কাঁধে নিল, তার পা দুটো কাঁপছে তখন। পূরো দ্রুত পা চালিয়ে কাম্মোর কাছ থেকে সরে গিয়ে নিজের বাড়ীর গলির দিকে চলে গেল।

সেদিনই দুপুরবেলা পূরোর ছেলেটা যখন জিদ করে করে কাঁদছিল আর পূরো তাকে সামলাতে ব্যস্ত, তখন দরজা ঠেলে কাম্মো একেবারে ওর ঘরের ভেতর চলে এলো।

পূরো এগিয়ে গিয়ে একেবারে নিজের শরীরের সঙ্গে কাম্মোকে জড়িয়ে নিল। পূরোর মনে হলো ওর নিজের ছেলের চাইতে কাম্মোকে তাদের সোহাগ দেখানো বেশী প্রয়োজন, কাম্মো—যার অশ্রুজল মুছিয়ে দেবার মত কাছের মানুষ কেউই ছিল না।

কাম্মোর চোখের জল গড়িয়ে পূরোর হাতের ওপর পড়ছিল। পূরোর মনের ভেতর থেকে থেকে কেবল একটা ভাবনাই পাক খাচ্ছিল যে যেমন ও জাবেদের মা তেমনই ও কেন কাম্মোরও মা হয়ে যাক না—কাম্মো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর পূরো তাকে উঠিয়ে উঠিয়ে বসালো, তাকে কোলে করে ঘুরল ফিরল, কতবার যে আদর করে তার মুখে চুমো খেল···ও জাবেদের মা, তো কাম্মোরও মা হয়ে যাক, ও সমস্ত অনাথ সন্তানদের মা হয়ে যাক···। ও তো ভাল কন্যা হতে পারেনি, ও অন্তত ভাল মা হয়ে যাক······

কাম্মো তো হিন্দু আর পূরো······পূরো মুসলমান, যদিও এখনও ও নিজেকে শুধু পূরো নামেই জানে। কাম্মো তো পূরোর দেওয়া ঘরের জিনিষ খেতে পারে না, যদিও পূরোর খুব ইচ্ছে হতো নিজের হাতে কাম্মোকে ও কোন খাবার খাওয়ায় কি দুধের বাটিটাই

কাম্মোর মুখে ধরে দেয়…

পুরো আবার কাম্মোর ব্যথা লাগা পা ডলে দিল…গরম ঘি হাতে নিয়ে ডলে, তুলো দিয়ে সেঁক দিল তার পায়ে।

কাম্মো তাড়াতাড়ি তার বাড়ী ফিরে যেতে চাইল। চাচীর ঝাঁটা হাতে ধরা ভয়ঙ্কর মূর্তিটা এসে যেন কাম্মো মেয়েটার চোখে বিঁধছিল। কাম্মো লেপ সেলাই করার বড় সূঁচ নিয়ে আসছে এই বাহানা করে বেরিয়ে এসেছিল।

পুরো কাম্মোকে গুড় মাখানো বাদামের চিট খেতে দিল, তারপর তুলোর গরম জামা সেলাইয়ের বড় সূঁচ এনে দিল।

ঠাণ্ডা ক'দিন ধরে বেড়েই চলেছে। সকলেই মোটা কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে। সকলেই কালো কাপড়ের ছিট আর তুলো দিয়ে মোটা মোটা ফতুয়া তৈরী করে নিয়েছে। মোটা খেস্ এখন সকলেরই কাঁধে কাঁধে দেখা যায়।

কাম্মোর বাড়তি বয়স যেন তার শরীরের মধ্যেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। না তার শরীরে যৌবনের কোন চিহ্ন ফুটেছে, না কোন নতুন বস্ত্র বা জামা তার শরীরে চড়েছে। তার খালি পা ঠাণ্ডায় একেবারে ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছে।

পুরো কাম্মোর জন্য একজোড়া নতুন জুতো বানালো। কিন্তু কাম্মোর পক্ষে ওই জুতো পায়ে গলানো সহজ ছিল না।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর কাম্মোকে ওই জুতো জোড়া পরানো হল। আর কাম্মো তখন তার চাচীকে বলল সামনের ওই আখের ক্ষেতের পাশে পড়ে থাকতে দেখে সে নিয়েছে।

চাচী অবশ্যই কাম্মোর কথা বিশ্বাস করল না—গাঁয়ের মধ্যে এমন কে আছে যে নতুন জুতো ফেলে আসবে ক্ষেতে—কিন্তু চাচী চুপ করে গেল। কাম্মো জুতো ব্যবহার করতে লাগল।

কিন্তু প্রতিদিনই তো নতুন নতুন জিনিষ কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। পুরো ঠাণ্ডায় কাম্মোর স্বল্পবাস পরিহিত শরীরের কাঁপুনি লক্ষ্য করে খুবই কষ্ট পেত মনে মনে।

কেবল রাত্রির অন্তিম প্রহরের অন্ধকার সাক্ষী থাকতো যখন পূরো কাম্মোর মাজা বসনের বোঝা কি জলভর্তি পেতলের ভারী ঘড়াটা নিজের কঁধে বয়ে এনে কাম্মোদের বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিত। বেচারী মেয়েটা একটুক্ষণ নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতো।

কাম্মো প্রতিদিনই কোন না কোন সময়ে একবার পূরোর কাছে আসতই। কখনও বেলন দিয়ে তুলো সাফ করে দিত, কখনও যাঁতাতে ছোলা পিষে দিত, কখনও বা হামান দিস্তিতে মশলাপাতি কুটে দিত। পূরোও কাম্মোর অনেক কাজ হাতে হাতে করে দিত। তার চাচীর অনেক কাজ তাতে হয়ে যেতো। আর ছোট্ট জাবেদ এর মধ্যে কাম্মোর একেবারে নেওটা হয়ে গেল। কখনও কাম্মো না এলে, না আসতে পারলে, পূরো ছোট্ট জাবেদের কথা বলে পাঠাত। কাম্মো অবশ্য যতটা সম্ভব সময় করে রোজই একবার না একবার আসতই।

এখন পুরো আর কাম্মো মা-মেয়ের মত একে অপরের সঙ্গে আচরণ করতো, কি দুই সখীর মত গায়ে গা লাগিয়ে বসে জমিয়ে গল্প আড্ডায় মজে যেত।

এক একবার পূরোর খুবই ইচ্ছে হতো যে কাম্মোর জন্যে কিছু একটা তৈরী করে। কাম্মোর শুকনো শুকনো শরীরে এখন একটা হাল্‌কা আভা লেগেছে—কাম্মোর ভাঙ্গা ভাঙ্গা গাল ভরন্ত গোল হয়ে উঠছে। পূরোর ঘরে এসে কাম্মো চুল আঁচড়তো, আর পূরো তখন হাতে চিকন তৈল মেখে কাম্মোর মুখ, শরীরে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিত।

একদিন ভোরে মুখ দেখা আঁধারে, কাম্মো পূরোর বুকের ওপর পড়ে হু হু করে কেঁদে ফেলল। পূরো ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। কাম্মোকে দেখাচ্ছিল যেন নিঙড়োনো আখের মত।

পূরো তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল, তার মাথায় আদর করে চুমো খেলো—কিন্তু কাম্মোর কান্না আর কিছুতেই থামতে চায় না। চোখের জলে ওড়না ভিজল, চোখের জলে হাত ভিজে গেল।

'আমার চাচী বলছিল যে যদি তুই আর ওই দিকের বাড়ীতে যাস তাহলে তোর রক্ত খাবো আমি।' কাম্মো কথা গুলো বলতে বলতেই পূরোর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। প্রাণ ভরে কাঁদল কাম্মো, যেন পূরো তার একমাত্র আশ্রয়, আর সেই আশ্রয় থেকে কেউ তার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

'কিন্তু কেন ? আমি কি করেছি ?' পূরো অবাক স্বরে প্রশ্ন করল।

'চাচী বলছিল যে ওই মেয়েটা ঘর থেকে ভেগেছে, তুইও কোন দিন ওই মেয়েটার মত ভাগবি।' কাম্মো হঠাৎ কান্না থামিয়ে বলে উঠল। ভোরের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পূরো একেবারে ভেঙ্গে যাওয়া লতার মত নেতিয়ে পড়ছিল।

বাস্তব সত্য

পূরোর হৃদয়ে একের পর এক আঘাত স্পর্শ করছিল। ওর মন আর মস্তিষ্ক এই অল্প সময়ের মধ্যেই কমপক্ষে দশ বছর যেন এগিয়ে বেড়ে গেল। পূরোর বয়স এখন কুড়ি বছরের বেশী নয়, কিন্তু নিছক বয়স ওকে যে শিক্ষা দিতে পারে নি, তা ওকে জীবন যাপনের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতগুলো শিখিয়ে দিয়েছিল। একজন বুদ্ধিমান বিচারকের মত ও গম্ভীর হয়ে গেল। পূরোর মন এখন অনেক রকমের গভীর চিন্তায় ভরে ওঠে, অনেকরকমের ভাবনা ওর মন তোলপাড় করে। কিন্তু, কখনও ও ওর ভাবনা চিন্তাকে ব্যক্ত করে উঠতে পারে না। জলের তোড় যেমন পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে উঠে আবার জলের সঙ্গেই মিশে যায়, ঠিক সেইরকম ভাবেই পূরোর হৃদয় সাগর তরঙ্গে ওঠে আবার বিলীন হয়ে যায়।

কখনও কখনও পূরো রহিমের বাড়ীতে চলে যেত, ওদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্পসল্প করত। তাদের প্রতিবেশী এক বাড়ীর একটি

মেয়ের মলিন মুখ দেখে ও খুবই কৌতুহলী হলো। কতবার ভাবছে ও যে মেয়েটাকে একবার ডাকে। এক দুঃখিনী আর এক দুঃখিনীকে চিনতে পারে। সেই মেয়েটার মুখ, বড় বড় ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে এমন করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকত, যেন মনে মনে সেই মেয়েটাও পূরোর কাছাকাছি আসতে চায়। একসময় ঠিকই জানতে পারে পূরো যে বেশ কয়েক বছর আগেই মেয়েটার বিবাহ হয়ে গেছে। কেউ বলে মেয়েটাকে ভূতে বা প্রেতে ধরেছে, আবার কেউ বলে মেয়েটার শরীরে কোন গোপন রোগ জ্বালা আছে। কি জানি কি হয়েছে মেয়েটার, শরীর তার খুব দুর্বল হয়ে গেছে, মুখে কেমন একটা ফ্যাকাশে ভাব। ভারী রুগ্ন মনে হয়।

পূরো আসতে যেতেই একসময় মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল যখন পূরো সেই মেয়েটার মাকে দিয়ে একটা খেস্ (গরম জামার মত) তৈরী করিয়ে নিল। সেই মেয়েটাকে সবাই তারো নামে ডাকে।

কিছুদিন পর পূরো জানতে পারল, যে কয়েকবার মেয়েটা অজ্ঞানও হয়ে গেছে। এখন সে মা বাবার কাছে আছে। এবার তাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। পূরো শুনতে পেলো যে প্রতিবার শ্বশুরবাড়ীতে যাবার সময় মেয়েটার ওই দশা হয়। আর যতবার মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসে তখনই দেখা যায় যে মেয়েটার শরীরে মাংস বলতে আর কিছু নেই। প্রতিবারই দেখা যায় একেবারে হাড্ডিসার হয়ে এসেছে মেয়েটা।

যারা দেখে তারা মনে মনেই বলে যে ব্যস্, আর একবার শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরলেই চিরতরে দুঃখ ঘুচে যাবে মেয়েটার, তখন আর শুকিয়ে যাবার জন্যে মাংস বলতে কিছুই থাকবে না মেয়েটার, হাড়েও থাকবে না প্রাণটুকু ধরে রাখার শক্তি। সব বুঝেও কিন্তু মুখে কেউ কিছুই বলে না। শ্বশুরবাড়ী থেকে যে নিতে আসে সেও কিছু বলে না বা এদিকে মেয়েটার বাপের বাড়ীর কেউও মুখ খোলে না।

একদিন তারো একেবারে একাকী বসে ছিল। পূরো গিয়ে তার

পাশে বসে পড়ল। আগেও দু'একবার কথা বলেছে পুরো, আজ একেবারে কথা বলার জন্যই তার পাশে গিয়ে বসেছে।

'তারো? কেউ না কেউ তো বলে থাকবে যে তোর কি হয়েছে?'

'কিছুই হয় নি।'

'আরে কেউ কি তোর নাড়ী পরীক্ষা করে দেখেছে?'

'নানান কোরব্বা আর পাচন গিলতে গিলতে আমি শেষ হয়ে গেছি।'

'তারো, একটু খোলসা করে বল্, কেন নিজের জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছিস?'

'ভালই তো করছি। পৃথিবীর বোঝা কিছুটা হালকা হয়ে যাবে, বোন। তুই এত চিন্তা করিস কেন?'

'পৃথিবীর ঘাড়ে তো এমনিতেই কত বোঝার পাহাড়। তার মধ্যে তুই না থাকলে কতটা আর কম পড়বে। নিজের মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ যে তোকে কত কষ্ট করে পালন করেছে।'

'পেলেছিল হয় তো,' তারো বেপরোয়া স্বরে বলল, 'দু'চার দিন কেঁদে কেটে চুপ করে যাবে। সেই বা কেমন সুখে আছে!'

'কিন্তু এমন কি ঘটেছে। মা-কে বলে দেখ আরও কটা দিন পর যেন তোকে পাঠায় শ্বশুরবাড়ীতে।'

'তাতে আর কতটুকু লাভ হবে। এখানে যেভাবে আছি, সেখানেও এভাবেই থাকব।'

'হ্যাঁ, মেয়েদের কে আর কটা দিন ধরে রাখতে পারে।'

'মেয়েদের,······হুঁহ্···'···তারো বিড়বিড় করতে করতে চুপ হয়ে গেল। তার মনে না জানি কিসের এক ঝঞ্ঝা, না জানি কি বলতে চায় সে, অথচ বলতে পারে না।

'মেয়েদের আর করার কি থাকে, মা-বাবার যাকে পছন্দ হয় তার হাতেই মেয়ের গলায় বাঁধা দড়িগাছাটা ধরিয়ে দেয়।' তারো কিছুক্ষণ পর বলে উঠল।

'ওখানকার জল কেমন, ভাল ?' পূরো জিজ্ঞেস করল।

'ভাল না হলেও ভাল।' তারো জবাব দিল।

'হতে পারে হয়তো সেখানকার জল তোর শরীর নিচ্ছে না।' পূরো কথা বার্তা চালিয়ে যাবার অজুহাতেই বলল।

'মেয়েদের তো সব জায়গার জলই সয়ে যায়, সইয়ে নিতে হয়।' তারো এমন ভাবেই কথাকটা বলল যে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পূরো।

'তারো, আমিও তো তোরই মতন, আমাকে বলছিস না কেন কিছু ?' পূরো এমন সহৃদয় স্বরে কথাগুলো বলল যে তারো হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো খুলে গেল।

'বোন! আমি কি বলব, মেয়েদের তো ভগবান বলবার মত মুখ দেন নি।'

'কথাটা ঠিকই বলেছিস তারো।'

'মা-বাবার কাছে আর থাকার মত স্থান আমার নেই, কেননা, কোন মেয়েরই শেষ পর্য্যন্ত মা-বাবার কাছে থাকার স্থান থাকে না। আর আমার স্বামীর কাছেও থাকার মত জায়গা আমার নেই, কেননা ওনার মনে আর ঘরেও অন্য আর একজন মহিলার বসতি।'

'তারো, তোর আদমির কি আগেই বিয়ে হয়ে গেছলো! তো তোর মা-বাবা তোকে সেখানে ঠেলে দিল কেন ?'

'ওরা খবর পাননি তো প্রথমে, আর বিয়েও তো হয়নি তার কখনও। উনি তো একজন মহিলাকে ঘরে রেখে দিয়েছেন মাত্র।'

'কিন্তু তার মা-বাবা তো খবরটা নিশ্চয়ই জানতেন ?'

'জানতো সকলেই। সেই মহিলা তার স্বজাতও নয়, নীচু জাতের মহিলা। তার মা বাবা বলতো যে বউ যদি আসে তাহলে স্বজাতের মধ্যেই হতে হবে।'

'কিন্তু তারা একবারও ভাবলেন না যে পরের বেটি যখন ঘরে আসবে তখন তার হাল কি হবে কি হবে ?'

'অন্যের দুঃখের আর কে পরোয়া করে, বোন। তারা তো সব

জাঁক করে বলে যে আমরা খেতে দিচ্ছি, পরতে দিচ্ছি, স্বাধীনতা দিচ্ছি, এর পরও আবার দুঃখটা কিসের ?'

'মেয়েদের কেবল পেটে খেতে পাওয়া আর পরনের কাপড় পেলেই সব পাওয়া হয়ে গেলো ?' পূরো বলে উঠল।

'আমার বুকে ধ্বক্ ধ্বক্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তুই দেখতে পাচ্ছিস না! কিন্তু সবাই দেখতে পায়। দুটো বছর হয়ে গেলো, রুটি আর কাপড়ের বিনিময়ে আমি ওর কাছে আমার শরীর বিক্রি করি, গ্যাখ্ আমি একজন বেশ্যা···গ্যাখ্, গ্যাখ্ আমি একটা বেশ্যা মাত্র···" বলতে বলতে তারো পড়ে যায়, তার হাতের মুঠি দুটো শক্ত হয়ে এঁটে যায়, চোখ দুটো কপালে গিয়ে ঠেকে, শরীরটা তার ফাটাফুটি কাঠের মত নিশ্চল হয়ে যায়।

পূরো ভয় পেয়ে গেল। তারোদের ঘরে সেই সময় আর কেউ ছিল না। পূরো তো জানে না যে এই সময় কি করা উচিত। ভয় হচ্ছিল ওর। ভীষণ ঘবড়ে যাচ্ছিল। ও তারোর পা দুটো নিয়ে ডলতে লাগল, দাবাতে লাগল। কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিল, পায়ের তলা মালিশ করতে লাগল।

তারপর তারোর হুঁশ ফিরে এলো।

'তুই আমার শরীরে হাত দিস না, আমি একটা বেশ্যা, দেখতে পাচ্ছিস না তুই···দেখতে পাচ্ছিস না'···তারো এভাবেই বকে যেতে লাগল।

পূরো ভাবছিল যে এখনও বুঝি মেয়েটার পুরোপুরি হুঁশ ফিরে আসে নি, ঠিক তখনই তারোর মা এল।

'হায়রে, আমি এখন কি করি, একে তো কপালের দোষে মরে আছি, এখন এই মেয়ের বাক্যির জ্বালা আমাদের একেবারে শেষ করে দেবে।' তারোর মা একেবারে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে বসে পড়ল। পূরো একটি কথাও বলল না।

'এই মেয়েটা আর এর ভাই, দুজনে মিলে আমাদের জান হালকান করে ছিল একেবারে। লাহোর কলেজে পড়তে গেল,

বোনটাকেও পড়িয়ে পড়িয়ে একেবারে বিগড়ে দিল। দেখ এখন, কেমন সব উল্টোপাল্টা এলোমেলো কথা বলছে।' তারোর মায়ের গলার স্বর দুঃখে ভারী হয়ে এল।

'অম্মা!' এই বেচারীর ওপরও তো জুলুম কম হয় নি।' পূরো বলল।

'বাছা! আমরা মেয়ে দিয়ে দিয়েছি, আমাদের এখন মুখ বন্ধ। এখন আর আমরা কি বলব! সে এখন ভালই রাখুক বা মন্দই রাখুক, পুরুষের জাত তো তারা।' তারোর মা থেমে থেমে বলল।

'আমার মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার পায়ে বেড়ি লাগানো হয়েছে, তার কি বিগড়েছে। ভগবান তো আর তাকে বেঁধে রাখে নি। তাকে বেঁধে রাখার মত ভগবানের আবির্ভাবই হয় নি এখনও। তাই যত দড়ি আছে সব ভগবান আমার পা দুটোতেই জড়িয়ে দিয়েছে।' আবার তারোর হাতের মুঠি দুটো শক্ত হয়ে উঠল, পা দুটোতে খিঁচুনি শুরু হলো। তার মা মুখে চোখে জলের ছিটে দিতে লাগল, মুখ ফাঁক করে করে জল খাওয়াতে লাগল।

পূরো একেবারে হতচকিত হয়ে গেল। আজ ও এই প্রথমবার অনুভব করল যে মেয়েরাও এইরকম ভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে, মেয়েরা এইভাবে বলে দিতেও পারে। এক এক সময় তো পূরোর বুকের ভেতরটাও গুমরে ওঠে, নিজেকে ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু কি ভাবে যে ব্যক্ত করবে তাতো জানা নেই।

'সব ধাপ্পা, ধোঁকাবাজি তোমাদের। আমার বিয়ে হয় নি, তোমরা সব্বাই মিথ্যেবাদী, মিথ্যেকথা বলছ। কেন তোমরা আমাকে ধরে রেখেছ? হটো, সরে যাও আমার কাছ থেকে··· বলতে বলতে অনুভবহীন তারো পা দুটো তার মেঝের ওপরেই দাপাতে লাগল।

'তারো, তারো, তোর কি জ্ঞানগম্যি লোপ পেয়ে গেল! চোখ খোল্, একবার তাকা, চোখ খুলে তাকা একবার! কি সব

উল্টোপাল্টা বকছিস্। ওসব আকথা কুকথা মুখ দিয়ে বার করতে নেই মা! কেউ যদি শোনে তো কি বলবে। হাজার হোক, সে তো তোর স্বামী। মুখে একটু লাগাম দে, তারো, এ ভাবে বলিস্ না।' তারোর মা এমন ভাবেই বলছিল যে মেয়েটা যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে সে খেয়ালই যেন তার নেই। যদিও চোখ দুটি তার জলে ভরে ওঠছিল।

তারোর কখনও একটু ক্ষণের জন্য হুঁশ ফিরছে কিনা ফিরছে পরক্ষণেই ফের বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে।

'সেখানে ফিরে গিয়ে ফের যেন পাগলের মত এইসব আউরাস না। জিভটাকে একটু সংযত রাখতে শেখ। সে মানুক বা না মানুক, ঈশ্বর তো সাক্ষী যে সে তোকে রীতিমত বিয়ে করে এখান থেকে নিয়ে গেছে।' তারোর মা এইভাবেই নিজের মনে বলে যাচ্ছিল।

'মা! ঈশ্বর যদি আমার বিয়েতে সাক্ষীই দিয়ে থাকেন তো মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছেন। মা, সেটা আমার বিয়ে ছিল না···' তারো কেমন যেন পাগল পাগল চোখ দুটি মেলে ঘরের ছাদের দিকের লম্বা লম্বা কড়ি বড়গা গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল! আর পূরো দেখছিল তারোর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে। এই মেয়েটা, এই তারো নামে মেয়েটা, ভাল মন্দ সব কিছু ভেবে দেখার পরও, ভাল মন্দ মিশিয়ে এতগুলো কথা বলার পরও, বিবাহ নামক ওই মেকি অনুষ্ঠানের মহান অসত্যটা থেকে কিছুতেই যেন নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না। অথচ, এদিকে তার জীবনের অন্তিম দিনটা বড় দ্রুত গতিতে জীবনের সমস্ত সত্য অসত্যকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে আসছিল।

এখন গোধূলি বেলা। পূরো বুকের মধ্যে ভারী এক বোঝা নিয়ে উঠে দাঁড়ল। ওর মনটা যেন এই ভর-ভরন্ত সংসারের বাইরে গিয়ে কোথাও একা একা উদাস হয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল।

গত কয়েকদিন ধরেই পূরো যেন নিজের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ফাঁদে আটকে পড়া জীবের মত আচ্ছন্ন হয়ে রইল। রশীদের যখন

তখন হাসি-মস্করা, ঘরের ছোট বড় কাজকর্ম আর সব চেয়ে বেশী শিশু জাবেদের আধো আধো বুলির আকর্ষণ যেন বন্দিনী পূরোর মনটাকে সূক্ষ্ম সুতোর ক্রমাগত প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে একেবারে বেঁধে ফেলেছিল। ওর মনের ভেতরটাও তাই কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছিল। আজ তারো নামে মেয়েটার খোলা কথাবার্তা বা প্রলাপ, যাই হোক, শুনে, ওর মনে হল, ওর মনের ওপর জড়িয়ে থাকা সূক্ষ্ম সুতোর বাঁধন বেশ কিছুটা আলগা হয়ে গেল। মনটা কেমন যেন বিকল হয়ে গেল ওর। রাতের বেলা রান্না করতে বসে নুন-মশল্লার আন্দাজ রইলো না, ডাল গেল পুড়ে, রুটিগুলোতো কিছু কাঁচা, কিছু পোড়া হয়ে গেল।

পরের দিনগুলোতে ওর উদাসীনতার তেমন কিছু উপশম হলো না। তারপর, না জানি মনে মনে ও কি কি সংকল্প করে নিল। ও দিনে মাত্র একবার আহার করতে লাগল। এক প্রহর রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়তে লাগল। কি ধ্যান ক ‸তে লাগল আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে, কান বন্ধ করে বসে থাকতে লাগল, যেন সংসার থেকে অনেক দূরে আপন চিত্তকে ও সরিয়ে নিয়েছে একেবারে। এই সংসারের প্রতি আর ওর কোন দায় যেন নেই।

ঘুম একেবারে কমে গেল পূরোর। খাওয়ার পরিমানও কমে গেল অনেকটা, আস্তে আস্তে ও নিজের জন্যে শুকনো বজরাতে কেবলমাত্র একটু নুন ছিটিয়ে দিয়ে মাত্র একটাই রুটি তৈরী করে তাই খেতে লাগল। না একটু ঘি বা খানিকটা দুধ কিংবা দইওলা, কেবল সেই শুকনো একটা রুটি। ওই একটা রুটি খেয়েই ও সমস্ত দিন গুজরান করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই পূরোর দুই চোখের নীচে নীল-নীল ছায়ার রেখা গড়ে উঠতে লাগল, সমস্ত শরীরটা ওর আভাহীন বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

এদিকে কয়েকদিন ধরেই রশীদও নানারকম কথাবার্তা বলে বলে পূরোর মনটাকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইছিল। নানান রকম নিয়ম ব্রত আর রোজার উপবাস ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করতে

লাগল এবং এইভাবে পুরোর মনটা পাল্টাবার চেষ্টায় কোনরকম ত্রুটি করল না রশীদ। এমন কি ভালবাসার উষ্ণ-আবেগ দিয়েও যেন আগের চেয়ে আরও বেশী করে করে খুশী করতে চাইল পুরোকে। কিন্তু রশীদের এই সমস্ত যত্ন, চেষ্টাই বিফল হল। পুরোর মন আর মস্তিষ্কে রশীদের এই সব প্রযত্নের কোন প্রভাবই পড়ল না। ওর আচার-ব্যবহারে কোন তারতম্যই ঘটল না।

প্রতিদিনের এই সাদর সমাদরের পরও যখন পুরোর কোনরকম পরিবর্তনই হলো না তখন রশীদের বুকের মধ্যেও কেমন একটা ধ্বসে যাওয়ার মত অনুভূতি হলো। দিন দিন পুরোর কৃশ হ'তে থাকা, বিবর্ণ হতে থাকা শরীরের দিকে তাকিয়ে সে যেন সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়ছিল। তাকিয়ে দেখতে পারছিল না আর পুরোর দিকে। তার ঘরের মধ্যে যেন নিঃশব্দতার-দৈত্যটা বেশ জাঁকিয়ে অধিষ্ঠান করে ফেলল। রশীদের মুখের ভাবেও একটা যন্ত্রণার কষ্ট ফুটে উঠতে লাগল। দুই প্রাণী এই ঘরের, সমাজের, শরীরের দেয়ালে ঘেরাও হয়ে রইল, দুজনের মাঝখানে যেন একটা শক্ত ভিতই গড়ে উঠল।

পুরোদের বাড়ীতে একটা মাদী মোষ আছে। ও নিয়ম করে তার দুধ দোয়, দই বসায়। রশীদের ক্ষেতে যারা কাজ করে, তারা যখন মোষের খাবার জন্যে ঘাস-খড় নিয়ে আসে বাড়ীতে, পুরো তখন তাদের, এমন কি তাদের ছেলেপুলেদেরও গেলাস ভরে ভরে লস্যি দিত, ওপর থেকে আলগোছে মাখনটুকু তুলে নিয়ে তাদের খাওয়াতো। কিন্তু পুরোর মুখে এসবের ছিঁটে ফোঁটাও পড়ত না। রশীদের মন থেকেও খাওয়ার ইচ্ছেটাই কেমন উবে যেতে লাগল। ঘরের মধ্যে উনুনের আগুন অবশ্যই জ্বালত, কিন্তু ঘরের মধ্যকার হাসিখুশী কথাবার্তা, জীবনের সজীব সবুজ বনানীর ওপর যেন ঘন কুয়াশার চাদর ঢাকা পড়ে গেছল। শিশু জাবেদের সরল, নিষ্পাপ মুখের ওপরও যেন মা-বাবার উদাস মুখের ছায়া পড়েছিল। জাবেদের জন্য বিশেষ কোন প্রশ্রয়ও ছিল না, যদিও পুরো কর্তব্য কাজ করতে কোন রকম ত্রুটি করতো না। আর রশীদও তাকে বুক

ভরে ভালবাসত।

একদিন রাতে শুয়ে থাকতে থাকতেই রশীদের শরীরে প্রবল জ্বর এসে গেল। শরীরের ভেতরটা তার জ্বলতে লাগল। সকাল হতে পূরো রশীদের মাথায় হাত দিয়ে দেখল যেন আগুন বেরোচ্ছে। জ্বর ভীষণ চড়ে গেছে।

গ্রামের হাকিমজী এসে ওষুধ পত্তর দিলেন। তিন দিনের পরও যখন জ্বর উপশমের কোন সম্ভবনা দেখা গেল না, তখন হাকিমজী শঙ্কা প্রকাশ করে বললেন যে হয়তো বা রশীদের মেয়াদী-জ্বরই হয়ে গেছে!

রশীদের এই হঠাৎ অসুস্থতা পূরোর এতদিনের উদাসীনতা এবং বৈরাগ্যের মনোভাবকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নিতে বাধ্য করল। ও নিয়ম মত-ওষুধ-পত্র সব খাওয়ানো, রশীদের শরীর টিপেদেওয়া সেবা-শুশ্রূষা যেমন করত তেমনই রান্না-বান্না বা বাইরের বিভিন্ন কাজের দিকেও খেয়াল রাখত। বাচ্চা জাবেদের মুখের ভাবেও কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া। বেলা চড়ে আর তার চিৎকার বাড়ে। কিন্তু পূরোর তখন তার দিকে মন দেবার অবকাশ থাকে না। এই ভাবে আরও কটা দিন কটা-রাত চলে গেল। কিন্তু রশীদের জ্বর নামল না।

'পূরো! আমার পাপের জন্য ক্ষমা করে দে। আমার ভুলের জন্য মাফ কর আমাকে। পূরো···পূরো···'···প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকতে লাগল রশীদ। রাতের তৃতীয় প্রহর তখন। পূরো ঘাবড়ে গেল। এতদিনের ক্রমাগত দুশ্চিন্তা এবং রাত্রি জাগরণ ওকে আগেই দুর্বল করে ফেলেছিল। ও উঠে ভয়ার্ত হয়ে রশীদের খাটের কাছে গিয়ে বসল। রশীদের মাথায় হাত বোলাতে লাগল, তার পা টিপে দিতে লাগল। কিন্তু রশীদের হুশ ছিল না কিছুই।

'আচ্ছা পূরো, আমি চললাম···পূরো, আমার আত্মা···'তারপর রশীদের সব কথা কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল। পূরোর বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে যেন লাফাতে লাগল।

'চুপ করো, রশীদ, আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিও না।' পুরো একেবারে আর্তস্বরে বলে উঠল। কিন্তু রশীদের তো কোন হুঁশই নেই। সে ওইরকম ভাবেই অস্পষ্ট স্বরে কি সব বলে যেতে লাগল। কোন কথা পুরো বুঝতে পারছিল, আবার বেশীর ভাগ কথাই রশীদের গলা থেকে বেরিয়ে ঠোঁটে এসেই মিলিয়ে যেতে লাগল।

প্রলয়-কালের মত ঘোর অন্ধকারময় রাত। পুরো ঘরের মধ্যে একা। কিন্তু ওর মনে হচ্ছিল যেন এই বিশাল বিশ্ব সংসারে আজ ও নিতান্ত একা। সেখানে রশীদ ছাড়া ওর ক্ষতে প্রলেপ দেবার মত আর কে-ই বা আছে!

পুরো রশীদের কপালের ওপর ঘড়ার ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে জলপট্টি দিতে লাগল। তার মাথা ধুইয়ে দিতে লাগল। কিন্তু রশীদের মাথাটা যেন উনুনের ইঁটের মত ভীষণ তপ্ত হয়ে উঠেছে। পট্টি ও দিতেই থাকল ঠাণ্ডা জলের পাত্রটিও যেন নিমেষেই গরম হয়ে উঠতে লাগল। জল বদলে নিল ও। ওর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল রশীদের উত্তপ্ত কপালের ওপর।

ভোরের আলো সবে উঁকি দিয়েছে, সেই সময়, কে জানে হয়তো বা জলপট্টি দেবার ফলে কিংবা অশ্রুজলে মাথা ভিজে যাওয়ার ফলেই রশীদের জ্বর নেমে গেল। তার শরীর তপ্ত অঙ্গার হয়ে উঠেছিল। এখন জুড়িয়ে গিয়ে বেহুঁশ অবস্থা কেটে গেল। তারপর আরামের নিদ্রায় বিলীন হয়ে গেল সে।

রশীদ যখন চোখ মেলে তাকালো, অনুভব করল সে যে তার শরীর অনেকটা হালকা লাগছে। আজ আর তার মাথার মধ্যে অসুস্থতার পোকাগুলো দৌড়দৌড়ি করছে না। রশীদ আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে শুলো। পুরো রশীদের মাথার কাছে মেঝেতে বসে চারপাইয়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর এক হাতে এখনও জলপট্টির ন্যাকড়া ধরা। পায়ের কাছে জলের পাত্রটাও পড়ে আছে।

পূরোকে ওই অবস্থায় দেখে রশীদের বুক ভরে উঠল। সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। ওর উদ্বিগ্ন মুখে এখন ঘুম নেমে এসেছে।

নিজের অসুস্থতা আর পারোর এই অটল সতর্কতা দেখে রশীদের মনের ভেতর তোলপাড় সুরু হল। পূরোর মুখের অবস্থা, এক হাতে জলপটি ধরা দেখে রশীদ বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারল যে কি কঠিন রাত ওকে কাটাতে হয়েছে। রশীদ তার দুর্বল হাতটা কোনক্রমে উঠিয়ে পূরোর মাথার ওপর রাখল। পূরোর বিস্রস্ত কেশরাশির মধ্য দিয়ে তার দুর্বল আঙ্গুলগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগল। আঙ্গুলগুলো তার পূরোর কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। পূরোর সমস্ত শরীরই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রশীদের চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল বিছানার ওপর। রশীদের মনে এক বিচিত্র আনন্দ উঠে তাকে জাগিয়ে রাখল।

রশীদ তো পূরোর সমস্ত শরীরের ওপর আধিপত্য করতে পেরেছিল, কিন্তু তার এই বাসনা ছিলই যাতে ওর আত্মার বা মনের ওপরও যেন পূর্ণ অধিকার কায়েম করতে পারে সে। পূরোর ওইরকম উদাসীন হয়ে থাকা ভেতরে ভেতরে তাকে যেন খেয়ে ফেলছিল। এখন সেই পূরো ছিঁড়ে আনা সর্ষেগাছের শাখার মত রশীদের চারপাইয়ে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

রশীদের শরীরে এখন কোন রকম শক্তিই নেই। কিন্তু ওর হৃদয়ে এমন ভাব জাগছিল যে সে পূরোকে একেবারে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। গত কয়েকদিনের ঘোর উদাসীনতা দেখে ওর হৃদয় অত্যন্তই পীড়িত বোধ করছিল। এখন রশীদ পূরোর মুখ ভাবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে পূরোর তনু মনে রশীদ ছাড়া অন্য আর কারও বসতি নেই। সে তার হাত আরও একটু বাড়িয়ে পূরোর গলা জড়িয়ে ধরল। বোধহয় হাতটা একটু বেশীই জোর দিয়ে ফেলেছিল, পূরো জেগে উঠল। কেঁপে উঠল সে। কিন্তু রশীদ ভাল হয়ে

গেছল, জ্বর নেমে গেছে তার, তীব্র আকুল দুটি চোখ মেলে পুরোকে দেখছিল সে।

রশীদ শয্যাশায়ী আজপ্রায় দশদিন। জ্বর সেরে গেছে তার। কিন্তু খুবই দুর্বল হ'য়ে গেছে সে। কিন্তু মন ওর খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছে। পুরো ওর সম্পুর্ণ প্রেম রশীদকেই অর্পন করে দিয়েছিল। রশীদের পাশে বসে থেকে থেকে ও যেন দিনরাত একাকার করে দিয়েছিল। ও জাবেদকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রশীদের পাশে বসিয়ে দিত। ছোটখাট অনেক কথা ও জাবেদকে বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল। জাবেদও হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে রশীদের চারপাশে ঘুরতো, রশীদ যা যা করত, তাই নকল করতে চেষ্টা করত। মায়ের শেখানো বুলিগুলো আধো আধো স্বরে বলতে চেষ্টা করত, বলতো। রশীদের মন খুবই উৎফুল্ল। শরীর তার ফুলের মত হালকা। মনে মনে সে এখন নিজের অসুস্থতার জন্য সৌভাগ্য বোধ করে। তার ঘরে খুশী এখন দ্বিগুন-তিনগুন হয়ে ফিরে এসেছে।

পুরোর মনে হ'তে লাগল যে ও সত্যি সত্যিই ভুলে যাক যে রশীদ কোনদিন ওর কাছে দোষ করেছে কোন। রশীদকে খুবই ভালবাসায় ভরে দিতে লাগল ও। রশীদ তো ওর স্বামী, ওর সন্তানের পিতা। ব্যস, এই এক ধ্রুব সত্য আর সবই মিথ্যে···

আরও একট খাঁচা

কিছুদিন পর। রশীদ দু'একবার নিজের গ্রাম ছত্তোয়ানী থেকে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাই ভাইয়ের সঙ্গে তার যে জমিজমা ছিল, সেখান থেকে আনাজ পত্তর নিয়ে বেচেও এসেছে কিছু। কিন্তু পুরো যেদিন থেকে এক্করআলে এসেছে, তারপর থেকে এই গ্রামের বাইরে আর পা রাখেনি ও। কখনও সখনও রশীদ কিছু বললে ও হেসে উত্তর দিত, 'আমি আমার নিজের মর্জিতে তো এগাঁয়ে আসিনি, কাজেই নিজের মর্জিতে এগাঁ ছেড়ে যাবও না।'

জাবেদ এখন বেশ হাঁটতে দৌড়তে পারে। রশীদ তো এমনিতে স্বভাবতই নরম, পূরোকেও সে বুক ভরে ভালবাসে, কিন্তু জাবেদের ওপর তার অপার স্নেহ। জাবেদকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে চুমো খেতে তার কোন ক্লান্তি ছিল না। জাবেদ এখন তোতলাতে তোতলাতে বেশ কথা বলতে পারে। আব্বা আব্বা বলতে বলতে রশীদের পায়ে পায়ে ঘোরে। জাপটে ধরে তাকে।

পূরো যখন মাটি জলে ছেনে নিয়ে উন্নুনটাকে ঠিকঠাক করে, তখন হঠাৎ জাবেদ দৌড়ে এসে উন্নুনের গা থেকে এক খাবলা কাদা মাটি তুলে নিয়ে ভেঙ্গে দেয় উন্নুনটা। পূরো লস্যির মধ্যে নুন দিয়ে খেতে আরম্ভ করলেই জাবেদ হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো কৌটো থেকে নিয়ে লস্যির গ্লাসে মিশিয়ে দেয়। জাবেদ দৌড়ে গিয়ে কপাটের আড়ালে লুকোয় তো রশীদ তাকে খুঁজতে থাকে। জাবেদের এই সব—আনিমানি খেলা, তার মিষ্টি হাসিতে রশীদ যেন মকাইদানার মত প্রস্ফুটিত আনন্দে মেতে ওঠে।

একদিন একজন স্ত্রীলোক ঘোড়া-পুতুল নিয়ে তাদের গলিতে বেচতে এলো। জাবেদ তো মাটির ছোট ছোট খেলনা আর টিনের তৈরী ঝুমঝুমি দেখেই পূরোর আঁচল ধরে টানাটানি আরম্ভ করল। পূরো কয়েক মুঠো আনাজ আর পুরোনো কাপড় দিয়ে টাট্টু-ঘোড়া-পুতুল কিনে দিল। তখনও ও পথেই দাঁড়িয়ে আছে, সেই সময় দেখতে পেল দূরে একটা পাগলী দৌড়ে যাচ্ছে।

মেয়েরা সব দৌড়ে গিয়ে যার যার বাচ্চাকে সরিয়ে নিল, বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিল। ছোট ছোট কটা অচেনা বাচ্চা চেল্লাতে আরম্ভ করল। পাগলীর শরীরে বুকের পিণ্ডদুটো ঢাকা পড়ে এমন একটুকরো ছেড়া জামা আর কোমরে একচিলতে সালোয়ার কোন ক্রমে আটকে আছে। তার গায়ের রঙ বুঝি রোদ্দুরে রোদ্দুরে পুড়ে ঝলসে গেছল, কিংবা রঙই ছিল কালো। মাথার চুল ধুলো ময়লায় ধূসর, রুক্ষ, জট পাকানো। দেখেই মনে হয় জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই আর বুঝি স্নানই করানো হয় নি তাকে। পাদুটো অদ্ভুত ভাবে টেনে টেনে

চলছে সে, চলার মুহূর্তে হাত দুটোকে দুপাশে এমন ভাবে ছুড়াচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন হাঁটছে না দৌড়চ্ছে। মুখের দিকে তাকাতেই তার ভয় পাওয়ানো হাসি মুখের বড় বড় দাঁতগুলোর দিকে দৃষ্টি না পড়েই পারে না। তার শুকনো, ঝল্‌সে যাওয়া শরীর দেখে বয়স অনুমান করা খুবই কঠিন। যেন একটা হাড়ের খাঁচা যেটা কেবলই দৌড়চ্ছে দৌড়চ্ছে।

পাগলীটা সমস্ত দিনভর কেবল ঘোরে, এখানে সেখানে কেবল ঘোরে আর ঘোরে। কখনও ক্ষেতে-খামারে গিয়ে কিছু একটা ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে থাকে। কখনও কখনও বাড়ীর মেয়েরা বসে থাকল পাগলীটার সামনে দু'একটা রুটি ছুঁড়ে দেয়। পাগলী হাতে নিয়ে চিবোয়। কখনও মেয়েরা কাটা, পুরোনো কুরতা-জামা তাকে পরিয়ে দেয়। পাগলীটা খিল খিল করে হাসে। জামাটা পরে থাকে, কিন্তু বোতামগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর কোনদিন জামাটাকেও দাঁত দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তখন সেই ছেঁড়া কাটা জামাটা গলায় ঝুলতে থাকে। তারপর পাগলী সেই ঝুলন্ত ছেঁড়া কাটা জামাটাকেও টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে নিজের শরীর থেকে দূরে ছুঁড়ে দেয়। কখনও কখনও নিজের শরীরে এক চিলতে সুতোও আর রাখে না। বাড়ীর মেয়েরা তাকে আবার পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া সালোয়ার কামিজ পরিয়ে দেয়।

পাগলী এখন এই মক্করআলী গ্রামে একেবারে চেপে বসে গেছে। প্রতিদিনই তাকে দেখা যেন অভ্যেসের মত হয়ে গেল সকলের। কখনও কখনও গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা পাগলীটার পেছনে লেগে যায়। হাততালি দিয়ে ক্ষেপায়, পাগলী দৌড়লে তার পেছন পেছন দৌড়তে থাকে। তখন রাস্তা দিয়ে আসা কোন বয়স্ক লোকের ধমক খেয়ে বাচ্চাগুলো পালায়। আর পাগলীর পেছনে দৌড়য় না।

ছেলেরা পাগলীর পেছনে লাগা ছেড়ে দিল। এখন মায়েরা খুব ছোট বাচ্চাদের পাগলীর কথা বলে বলে ভয় দেখায়, 'পাগলী এসে ধরে নিয়ে যাবে।' বলতেই কান্না থামিয়ে বাচ্চারা চুপ করে যায়।

পাগলী কোন একটা পূয়ালের (জংলী গাজ) নীচে পড়ে থাকে। কেউ কখনও খাবার জলের পাত্র একটা রেখে আসে তার কাছে, কখনও বা রুটি দু'একটা তার মাথার কাছে রেখে আসে কেউ। কোন একজন দয়ালু ব্যক্তি ছেঁড়া কাটা একটা লেপ গাছের নীচে রেখে দিয়েছিল। পাগলী নিয়ম করে সেই গাছের নীচে গিয়ে রাতে শুয়ে থাকত।

পাগলী কেবল দৌড়ত আর হাসত। কারো কোন বাচ্চাকে কখনও ভাল মন্দ কিছুই বলতনা। কারো কোন জিনিষ কোনদিন হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখত না। মাটিতে পড়ে থাকা রুটিফটির টুকরো কেবল উঠিয়ে নিত। মাটিতেই পড়ে থাকে সে রকম কিছু খাবার থাকলে তাই চাটতে স্লুরু করত।

কিছুদিনের মধ্যেই সব্বাই দেখল. আর পুরো তো আশ্চর্য চকিত হয়ে দেখল যে পাগলীর পেটটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠছে। গাঁয়ের সমস্ত এয়োস্ত্রীরা যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। পাগলী তো কিছুই বলে না, বকেও না।

পাগলীর শরীর দিন দিন ভরে উঠতে থাকে।

গাঁয়ের স্ত্রীরা সকলেই চাইত যাতে পাগলীর শরীরটাকে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখা যায়। কোন একটা গর্তের ভেতর তাকে আটকে রাখে। পাগলী তো কিছুই বোঝে না। সে আগের মতই হাসে, আগের মতই দৌড়য়।

একদিন গ্রামের কয়েকজন পুরুষ একত্র হয়ে পাগলীকে একেবারে গ্রামের সীমা পার করে ছেড়ে দিয়ে এলো। অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে নেমেছে। সেই রাত্রে কেউ আর পাগলীর দেখা পেলো না। সবাই ভাবতে লাগল যে পাগলী এবার এই গ্রাম ছেড়ে গেছে। চোখের সামনে নেই তো মনের মধ্যেও নেই, এবার পাগলীটা কোনো দুরু গাঁয়ে চলে যাবে।

পরের দিন, তখন ঠিক দুপুরও কাটে নি, পাগলী আবার সেই আগের মতই ক্ষেতের সামনে গিয়ে হাসতে লাগল।

'কেমন ধারা পুরুষমানুষ, সেই লোকটা। লোকটা নিশ্চয়ই কোন পশু, যে এই রকম একটা পাগলীকে এই রকম চরম দুর্দশায় ফেলে দেয়!' সব এয়োস্ত্রীরাই একেবারে ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। পাগলীর কথা মনে হলেই তাদের ভেতরটা একেবারে বিষিয়ে ওঠে।

যার শরীরে সৌন্দর্য বলতে কিছু নেই, যৌবন বলতে কিছু নেই, মাংসের শরীর, যার আপন পর বোধ নেই, যে কেবল জীবিত হাড়ের তৈরী একটা খাঁচা···। একটা পাগল খাঁচা···চিলগুলো সেই তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খেলো, খেতে পারলো···!' ভাবতে ভাবতে পূরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

পাগলীর পেট দিন দিন বাড়তেই থাকল।

খাঁচার মধ্যে খাঁচা

সেই রাত্রেরই শেষের প্রহর। তখনও অন্ধকার রয়েছে। এমন সময়ই পূরো রোজ ক্ষেতে যায় নিয়ম মাফিক। পূরো ওদের গলির বাইরের পাকদণ্ডীটার ওপর পা রেখেছে কি রাখে নি একটা গাছের নীচে দৃষ্টি পড়তেই দেখল যেন একটা মনুষ্যাকৃতি কিছু পড়ে আছে। পূরো কেঁপে উঠল। কিন্তু ও অত দুর্বল হৃদয়ের মেয়ে নয়। ধীর পায়ে ও পড়ে থাকা শরীরটার দিকে এগিয়ে গেল। পূরোর পক্ষে মানুষটাকে চিনতে দেরী হল না। পাগলীটা একটা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে সেই গাছটার নিচে পড়ে আছে। তার দু'পায়ের কাছেই এক নবজাত শিশুর শরীর পড়ে আছে যার নাড়ী এখনও মায়ের শরীরের সঙ্গে জুড়ে আছে।

পূরোর বুকের মধ্যে দম যেন বন্ধ হয়ে গেল। চোখের সামনে অন্ধকার নাচতে লাগল। মাথার মধ্যে ভাবনা চিন্তাগুলোও যেন লোপ পেয়ে যেতে লাগল।

পূরোর শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র কম্পন বহে গেল। ও

উঠেই বাড়ীর দিকে দৌড়ল। রশীদকে ডেকে নিয়ে এলো।

একটা ছেঁড়া চাদর নিয়ে এসেছিল পূরো। সেটা দিয়েই পাগলীর শরীরটা ঢেকে দিল আলগোছে। তখন রশীদ পাগলীর নাড়ী ধরে দেখল। দেখার কোন দরকার ছিল না, পাগলীর মুখেই মৃত্যুর স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছিল। চুলের একগুচ্ছ তার কপালে লেপ্টে রয়েছে।

প্রকৃতি তার জীবন স্পন্দন পুরোপুরি শক্তি নিয়ে পাগলীর শিশু-সন্তানের মধ্যেই অবস্থান করছে। শিশুর মুখে তারই ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রয়েছে।

'হায় আল্লাহ্!' রশীদের মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো, তারপর সে চাকু দিয়ে বাচ্চার নাড়ী কেটে দিল।

পূরো বাচ্চাটাকে নিজের দোপাটা দিয়ে জড়িয়ে নিল। তারপর দুই প্রাণী ঘরে ফিরে এলো।

ভোরের কুয়াশার মত এই খবর সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। যে সব স্ত্রী আটা মাখতে বসেছিল, তাদের হাত থেকে পাত্র ছিটকে গেল। যারা রুটি তৈরী করছিল তারা জ্বলন্ত উনুন ছেড়ে পূরোর বাড়ীতে এসে শিশুটাকে দেখে যেতে লাগল।

তুলোর গোলার মত নরম আর নির্মল শিশুকে পূরো নাইয়ে ধুইয়ে ছোট খাটিয়াতে শুইয়ে রেখেছিল। সামান্য উষ্ণ দুধের মধ্যে কাপড়ের ছোট সলতে পাকিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বাচ্চাটার মুখে ধরেছিল পূরো। শিশু বেশ চনমনে হয়ে আগ্রহ ভরে কাপড়ের সলতে থেকেই দুধ চুষে চুষে খেতে লাগল। জাবেদ নিজের ঘরে আসা এই ছোট্ট পুতুলটাকে বারে বারেই ঝুঁকে পড়ে পড়ে দেখে যাচ্ছিল।

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!···তোর সন্তান বেঁচেবর্তে থাকুক!' ···খুব পুণ্য করেছো এটা।'—গাঁয়ের স্ত্রীরা আসে আর ঐসব কথা বলে, অনাথ শিশুটার ওপর দয়া দেখানোর জন্য বাহবা দেয়, তারপর যে যার মত ফিরে চলে যায়।

দু'চারজন লোক মিলে পাগলীর শবটার একটা গতি করে দেয়।

অন্ধকার হয়ে আসছে তখন। পূরো বাচ্চাদের নিয়ে নানান কাজে ব্যস্ত। রশীদ লণ্ঠনটা মুছে সাফ করে জ্বালাল। বাচ্চাটা বড় বড় চোখ মেলে লণ্ঠনটার দিকে তাকাল। তার অবুঝ দৃষ্টি কোন এক বস্তুতে স্থির থাকে না। আবার তার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরে গেল।

পূরো গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

ভাবতে লাগল, কেমনতরো ছিল সেই পুরুষটা যে পাগলীটার ঝলসানো-কালো কঙ্কালটাকে স্পর্শ করতে পারলো! তবে কি পাগলীটার ইচ্ছেতেই এমনটা ঘটেছিল, জোর জবরদস্তি হয়েছিল তার সঙ্গে! ওই পুরুষটা কি ভুলেও একবার ভাবেনি যে সে পাগলীটার প্রতি কি ভীষণ ভারী অত্যাচার করছে। সেই পুরুষটার কি একবারের জন্যও নিজের ঔরসজাত শিশুটার কথা মনে পড়ল না, যে পাগলীটার শরীরের আধারে জমা করে গেল!

হয়তো পাগলীটা জানতই না যে তার ঘরে একটা শিশুর জন্ম হবে। প্রসব যন্ত্রণা কি করে সে সহ্য করল! কোন দাঈয়ের দয়া হল না তার ওপর। রাতের অন্ধকারে হয়তো চিল্লিয়ে মরেছে পাগলীটা! খোলা বাতাসের ঝাপ্টা তার শরীরে বোধহয় শূলের মতই বিঁধেছে! ঠাণ্ডা মাটিতে পড়ে থেকে হয়তো কেবলই সে ছটফট করেছে। কিন্তু এর মধ্যেই প্রকৃতির কঠোর নিয়মে বাঁধা তার শিশুটি যন্ত্রণার কাল পূর্ণ হলে পর আপনা আপনিই এই দুনিয়ার মধ্যে এসে পড়েছে, ভূমিতেই হয়তো গড়িয়ে পড়েছে, আর যন্ত্রণার পীড়ায় কাতর হয়ে পাগলীটার জীবনের সূতো ছিন্ন হয়ে গেছে!

তারপর পূরোর মনে হলো—বেঁচে থেকেই বা কি পাবার ছিল—পাগলীর! সে কি নিজের বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারতো। ভালই হয়েছে যে মরে গেছে। তার শিশুটা কি সুন্দর হয়েছে! বাঁকাচোরা হাড়ের ঝল্‌সানো খাঁচার মধ্যে কি করে এমন সুন্দর শিশুটা বেড়ে উঠল! কি সুন্দর বড় বড় দুটো চোখ! সমস্ত দেহটারই কি সুন্দর ছাঁদ, গড়ন! পুরোপুরি একটা ছোটখাট পুরুষের

ছোট্ট প্রতিরূপ যেন। না জানি কোন্ সে হতভাগা বাপ এই শিশুটার।

ভাবতে ভাবতে পূরো একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পূরো দেখল, একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর ওকে তুলে নিয়ে রশীদ ভাগছে। কোন একটা বাগানের মধ্যে একটা ছোট্ট ঘরের ভেতর ওকে তিন তিনটে দিন আটকে রেখে শেষে রশীদ ওকে ঘর থেকে বার করে দিল। পূরো পাগল হয়ে গেল। ও অলিগলিতে ঘুরতে লাগল। ওর পেটের মধ্যে একটা বাচ্চা সড়্‌সড়্ করেছে, আর তারপরে··· তারপর একদিন একটা গাছের ছায়াতে ও এক বাচ্চার জন্মদিল, যার চেহারা ঠিক জাবেদের মত। ওর বাচ্চা ওর বুকের সঙ্গে লেগে একটু দুধের জন্য কেঁদে ভাসাচ্ছে, কিন্তু পূরোর বুকে দুধ নেই, বেরুচ্ছে না দুধ···

কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠল পূরো। সামনেই ছোট্ট খাটের ওপর ওর নতুন বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। ও তাকে উঠিয়ে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। তারপর ভয়ে ভয়ে নিজের সন্তান জাবেদের মুখের দিকে তাকালো। সে একটু আগেই পাশের খাটে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় ভয় চোখে ও তারপর বাইরে উনুনের ধারে বসা রশীদের দিকে চেয়ে দেখল। রশীদ এখনও ওকে ছেড়ে যায় নি বা ওকেও ঘর থেকে বার করে দেয় নি। ও নিজের ঘরেই নিশ্চিন্তে বহাল তবিয়তেই আছে। রশীদ ওর দয়ালু স্বামী, জাবেদ ওর কোঁক্‌ড়ানো চুল সুন্দর বালক পুত্র। ওদের পাড়ার কাম্মো নামে মেয়েটা চুপে চুপে পালিয়ে এসে ওর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলে এখনও। ওর কাছে একটু ভালবাসা ছিনিয়ে নিতে আসে। আর পূরো পরিবার তো আরও বেড়ে গেছল। ওর ঘরে ভগবান নিজেই আর একটা পুত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও ঝুঁকে পড়ে নবজাতকের কপালে চুমো খেলো।

তারপর ও উঠে হাত ভরে সাদা জিরা খেলো। জাবেদ পুরো দুবছর ওর বুকের দুধ খেয়েছে। আর দুধ ছাড়িয়েছে ও তাও বেশীদিন

হয়নি। ও শুনেছিল যে সাদা জিরে খেলে মেয়েদের বুকে দুধ আসে ও বাচ্চাটার মুখে নিজের একটা স্তন লাগিয়ে দিল।

দিন তিনেক পর সত্যি সত্যিই পূরোর বুকে দুধ ভরে এল। গাঁয়ের মেয়েরা তো দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগল। ছেলেটা পূরোর কণিষ্ঠ সন্তান হয়ে পালিত হতে লাগল।

দাবীদার

ঘেরা ইঁটের উনুনের ভেতর আগুন যেমন ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে, ঠিক সেই রকমভাবে গ্রামের মধ্যে ফুস্সুর-ফুস্সুর চলতে লাগল: 'পাগলীটা হিন্দু ছিল, তার বাচ্চাটাকে মুসলনানেরা নিয়ে নিল। সমস্ত গাঁয়ের চোখের সামনে ওরা হিন্দু বাচ্চাটাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলল……'

যেভাবে বিড়াল নিজের বাচ্চাকে সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে লুকিয়ে রাখে, পূরো সে ভাবেই ছোট ছেলেটাকে নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বাড়ীর ভেতর দিককার একটা ছোট কুঠরীতে বসে থাকে। তবুও নানান কথা দেয়াল ভেদ করে ওর কানের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

প্রথম প্রথম দু'একটা হিন্দু ঘরে বৈঠক বসতো।

'এটা খুবই সত্যি কথা যে পাগলীটা হিন্দু ছিল।' কেউ একজন বলল।

'আমি নিজের কানে শুনেছি যে পাগলীটা লালামুসের এক ভাল পরিবারের মেয়ে ছিল। ছিল ভালই। কিন্তু তার এক সতীন মৃত মানুষের ছাই কৌশল করে খাইয়ে দিয়েছিল। ব্যস! সেই থেকে পাগল হয়ে গেল মেয়েটা।' অন্য আর একজন বলল।

শুনেছি যে তার পরিবারের সবাই মেয়েটাকে ঘরে বন্ধ করেই রেখেছিল। কিন্তু মেয়েটার ভাগ্যে খোঁয়ারী ছিল খণ্ডাবে কে।' আর একজন বলল সখেদে।

'আরে মশাই আসল কথাটা তো অন্য। আমি নিজের চোখে

পাগলীটার হাতে 'ওম্' লেখা উল্কি দেখেছি।' আর একজন মাটিতে চাপড় দিয়ে জোর গলায় বলে উঠল।

ভাইসব ঘোর অন্ধকার ধেয়ে আসছে। আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে মুসলমানরা।

''ধিক আমাদের! হিন্দুর ছেলেকে ওরা মিনিটের মধ্যে মুসলমান বানিয়ে ফেফল!'

'ওসব কথা ছাড়ুন ভাইসব। কে জানে ছেলেটা কার পাপের ফসল না কি। আমরা তাকে নিয়ে এমন আর কি করব।' কোন একজন মাঝখান থেকে এমন কথাও বলে দেয়।

'নালায়েক! বোকার মত কথা! প্রশ্নটা এখন ধর্মের। এই ভাবে ওরা তো কালকেই সমস্ত গ্রামটাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলবে। আর তুই তখন ওদের মুখের দিকে ভ্যাল ভ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখবি!' দু'একজন লোক বেশ উচ্চ স্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে।

ঘরের বাতাস এমন ভারী হয়ে ওঠে যে বদ্ধ সেই বাতাসে বদ্ধ ঘরের মধ্যে সবাই যেন দম আটকে বসে আছে!

'ছেলেটাকে আমরা ফিরিয়ে আনব। দেখি, কে আমাদের হাত তুলে বাধা দিতে আসে।'

'আরে, কিছু পয়সা কড়ি নিয়ে তো কথা। চাঁদা তুলে ব্রজবাসীনিকে ধরে দেব। আনন্দের সঙ্গে সে ছেলেটাকে পালন করবে।' কেউ একজন উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলো বলতে বলতে আরও একটু এগিয়ে এসে বলল।

'কেন! অত দূরে পাঠাবার কি হয়েছে। সমস্ত গাঁয়ের লোক মিলে একটা বাচ্চাকে পালন করতে পারবে না?

'কে বলতে পারে যে বাচ্চাটাও পাগলীর মত বোবা-কালা হবে কি না শেষ পর্য্যন্ত···বাধা দিয়ে মাঝ থেকে কেউ বলে ওঠে।

'তাতে কি হয়েছে। বড় হয়ে ধর্মশালায় ঝাড়ুদারের কাজ

করবে। আরে কটা রুটিই তো খাবে। তার বেশী তো কিছু নয়।"

এই ভাবে জমায়েতের সকলেই পরস্পরকে সাধুবাদ দেয়, প্রশংসা করে প্রসন্ন মনে।

'সবার আগে ব্রজবাসীনিকে তো জিজ্ঞেস করা দরকার।' একজন বলল।

ওই, দেখ! কথা শোন! আরে সে কি বাচ্চাটাকে রাখবে না, রাখতে রাজী হবে না? সব চেয়ে আগে চাঁদির জুতো তার মাথায় রাখব, তারপর তার সঙ্গে কথাবার্তা বলব। হুঁ!'

'আরে ভাই ছেলেটার আর কি। ধর্মশালাতে তো এমনিতেই মুফতে কাজ করার জন্য কত জনকে পাওয়া যায়। তাই না!'

'আরে, এখনই ওসব নিয়ে ভাবার কি দরকার! ছেলেটার লালন পালন তো হোক। প্রথমে তার···'

'কি মুশকিল! এখনই আপনারা এত উতলা হচ্ছেন কেন। ধর্মের জন্য যদি এটুকুও না করতে পারেন তো তাহলে যান, পাতকূয়োতে ডুবে মরুনগে যান।

'তোমার ক্ষেতের জল যদি অন্য কেউ তার নিজের ক্ষেতের দিকে আল্‌কেটে নিয়ে যায় তখন তুমি তার মাথা ফাটিয়ে দাও, আর আজ তোমাদের হিন্দুর ছেলেকে যখন সে তুলে নিয়ে চলে গেল তো তোমাদের মুখে কুলুপ্ এঁটে গেল, তালা লাগিয়ে বসে থাকবে মুখে!'

ঘরের বাতাস অকস্মাৎ এমন ভারী হয়ে উঠল যেন পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাদের!'

রশীদ আজকাল যখন নিজের ক্ষেতে কাজ করতে যায় তখন আশপাশ দিয়ে যেতে থাকা হিন্দুরা তার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকায়। রশীদ তার নিজের মনে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায়।

দু' একবার ও পুরোকে বলেছে যে দেখ গ্রামের আবহাওয়া তেমন সুবিধের নয়। এই বিবাদের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে কি লাভ। ক্রমশঃ কথা বাড়বে। ছেলেটাকে ওরা নিয়েই যাক যদি

ওদের সেই রকমই ইচ্ছে হয়। তারপর ছেলেটার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

পূরো অবশ্য বলতো না কিছুই। কিন্তু ওর মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। এই ছোট্ট হাড়ের টুকরোটাকে দিন-রাত নিজের বুকের সঙ্গে সাপ্টে রেখে আজ ছমাস ধরে লালন-পালন করেছে ও। এখন বাচ্চাটা জাবেদের মতই কি সুন্দর গোলগাল হয়ে উঠেছে। বাচ্চাটা এখন তাকিয়ে পূরোকে চিনতে পারে। পূরো যখন যেদিকে যায় বাচ্চাটার চোখ দুটোও সেদিকেই ঘুরে ঘুরে তাকিয়ে দেখে। রশীদকে দেখে সে হাত পা ছুঁড়ে আহ্লাদ প্রকাশ করে…

পূরো তাই ভাবে যে সেই প্রথম দিনই কেন হিন্দুদের খেয়াল হল না, বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবার? তারা যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতো তখন, পালন পোষন করত, কোন মায়ের কোলে দিয়ে দিত, পিতার স্নেহ দিত বাচ্চাকে। তাহলে কোন দুঃখ থাকতো না। কিন্তু সে ছ'-ছ'টা মাস পূরো রাত জেগে অনিদ্রায় কাটিয়েছে, সাদা জিরা খেয়ে খেয়ে নিজের শুকিয়ে যাওয়া বুকে দুধ আনিয়েছে, বাচ্চার গু-মুত কেচেছে নিজের হাতে।

তারপর পূরোর মনে পড়ে যে বাচ্চাটার মুখে যখন প্রথম মিষ্টি দেয় তখন ও সেই সঙ্গে নিজেদের প্রতিবেশী মুসলমানদের ঘরে ঘরে পঞ্জুরী (এক রকমের মিঠাই) পাঠিয়ে সবাইকে বলেছে যে ছেলেটা বড় হয়ে কখনও যেন না ভাবে যে তার জন্ম সময়ে পৃথিবীর কোন মানুষ তার জন্যে কিছুই করে নি।

একদিন গ্রামের প্রমুখ মাতব্বর ব্যক্তিরা রশীদকে ডেকে পাঠাল। পূরোর মুখে চিন্তার গভীর ছায়া নামল। বাচ্চাটার পালন পোষণের দায়ভাগতো ওর নিজেরই, কিন্তু ওই লোকগুলো রশীদকে এখন ভাল-মন্দ-কি সব বলবে, তাকে অপমান করবে…

তাই পূরো বলছিল যে ও নিজেও রশীদের সঙ্গে যাবে। কারণ তাদের প্রশ্নের জবাব দেবার দায় তো ওরই। ও নিজে উপস্থিত হয়ে না হয় ছেলেটাকে ভিক্ষে চেয়ে নেবে…কিন্তু রশীদ শুনল না ওর

কথা ; মানল না। সে একাই সেখানে চলে গেল যেখানে গ্রামের মাতব্বররা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

গ্রামের একজন সম্মানিত হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ীর উঠোনে তিন চারটে চেয়ার পাতা ছিল। সেই সব চেয়ারে গ্রামের কিছু প্রমুখ হিন্দু সজ্জন বসেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন যে রশীদ হয়তো বা তিন চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে আসবে, অথবা আদৌ হয়তো আসবেই না। সে ক্ষেত্রে তারা হয়তো অন্য কোনরকম ভাবে রশীদের ওপর চাপ দিতে পারতেন। কিন্তু রশীদ একেবারে একাকীই চলে এল। সেলাম ছুয়া করে তাদের সকলের সামনে বসে পড়ল সে।

'কি ভাই, তোর মনের ইচ্ছে কি? ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিবি না কি?' হুকোর নল থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে মাতব্বরদের একজন ভারী, দরাজ গলায় বলে উঠলেন।

'আমি কোন্ সাহসে তা বলব। আল্লাহ্ দিয়েছেন তাকে। আমি দেবারই বা কে, নেবারই কে' রশীদ এক হাতে তার মাথা ছুঁয়ে আকাশের দিকে নির্দেশ করল।

'এসব তো টালবাহার কথা, সোজা কথা সোজা ভাবে বল্। এক জন বেশ রাগের স্বরে বলে উঠলেন।

'আমি তো আল্লাহ্-এর দয়ায় তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলাম। যে সময় আমি সেখানে পৌছেছিলাম, তার কয়েক মিনিট পরে যদি পৌছতাম, তাহলে কে জানে, হয়তো বাচ্চাটাকে কুকুর বিড়ালেই মুখে করে নিয়ে যেতো। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যে ছেলেটা বেঁচে থাকুক...

'ঠিক আছে। যদি ভগবানের ইচ্ছাতেই আয়ুর সুতো তার লম্বা হয়ে থাকে তো তাকে আর কেউ ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। কিন্তু একটা কথা তোর মনে রাখা উচিত যে বাচ্চাটার মা হিন্দু ছিল, কাজেই তুই যে একটা হিন্দুর ছেলেকে তুলে নিয়ে যাবি, এটা তো আমাদের সইবে না।'

'আমি তো জানতাম না যে পাগলীটা হিন্দু ছিল। সে তো হিন্দুর

ঘর থেকেও চেয়ে খাবার খেতো, মুসলমানের ঘর থেকেও চেয়ে চেয়ে খাবার যেতো···' রশীদ বলতে লাগল।

'কিন্তু মেয়েটাতো পাগলী ছিল, তুই তো আর পাগল নোস্।' মাঝখানেই বাধা দিয়ে কেউ বলে ওঠে।

'ভালো কথা। কিন্তু সেই প্রথম দিনই যদি আপনারা বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতেন. তার পালন পালন করতেন। কি নিজের কাছে বাচ্চাটাকে রাখার দাবী করতে পারতাম! একমুঠো একটা কঙ্কাল শরীর। আমার বউ সেই কঙ্কলটাকে জান-প্রাণ দিয়ে এই ছ'মাস ধরে পুষ্ট করেছে। এখন যখন ছেলেটা বেঁচে উঠেছে, তখন আপনাদের মনে পড়েছে তার কথা। আল্লাহ্‌র দোয়ার কথা স্মরণ করুন। আপনারও তাঁর দয়াতেই বাচ্চাটাকে পালবেন, আমিও তো খোদার ইচ্ছেতেই তার পালন পোষণ করছি। তাছাড়া, আর কিভাবে আমার লাভ হচ্ছে বলুন আপনারা···' রশীদ এমন আবেগের সঙ্গেই কথাগুলো বলল যে দুতিন জন ব্যক্তির মুখভাবে এমন কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন তারা মনে মনেই বলছে যে ভাই, বাদ দাও, এই ঘটনার এখানেই শেষ হোক, পালছে তো পালুক, খামোখা একটা আপদকে যখন গলায় ঝুলিয়েছে তো তার গলাতেই গোটা ঝুলুক।

'দেখ, কথা আমরা বাড়াতে চাই না। বাচ্চাটা আমাদেরও কেউ না, তোরও কেউ না। প্রশ্নটা এখন ধর্ম নিয়ে। কাজেই ধর্মের পথে তোর বাধা হয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়। ঝুটমুট তুই নিজের প্রাণটাকে সঙ্কটে ফেলে দিবি তাহলে। কেউ যদি তোর ভাল-মন্দ কিছু ঘটিয়েই দেয় তো তার দায়-দায়িত্ব কিন্তু আমরা কেউ নেব না। কাজেই মানে মানে সোজা রাস্তায় পা দে। বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দে। তার বদলে এতদিন যে বাচ্চাটার পেছনে খরচপাতি করেছিস, তার জন্যে দু-চার টাকা নিতে হয়, তাও না হয় নিয়ে নে।' একজন বললেন।

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই।' সকলেই বলে উঠল।

'আল্লাহ্...আল্লাহ্...' রশীদ দু'কানে হাত রেখে আর্তনাদ করে উঠল।

'ব্রজবাসীনি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে আরও দুতিন জন লোক যাচ্ছে। তোর ঘর থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবে। তাকে শুদ্ধ করে টরে নেওয়া—সেসব আমরা যা করার করব।'

'আমি আর একবার আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, ছেলেটাকে দয়া করুন, সে যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দিন। আমার বউ তাকে নিজের পেটের সন্তানের মত পালন করছে।' রশীদ দুই হাত জোড় করে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমরা তোকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। যদি নিজের মঙ্গল চাস তো ভালোমানুষের মত ওঠে পড়, চল। না হলে আমরাও জানি যে সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।' দুতিন জন লোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়ীর ভেতর থেকে ব্রজবাসীনি গায়ে চাদর দিয়ে বেরিয়ে এল। রশীদকে উঠে দাঁড়াতেই হলো। তারপর সবাই রশীদের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

পূরো নিজেদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে গলির দিকে তাকিয়ে পায়ের শব্দ শোনার অপেক্ষায় ছিল। যেমনই ও রশীদকে মাথা নীচু করে তিন চার জন লোকের সঙ্গে আসতে দেখল, ওর বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা ধ্বক্ করে কেঁপে ওঠল!

পূরোর চোখের সামনে সেই দিনগুলোর ছবি স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল যেদিন ওর নিজের মা ওর কাছ থেকে সরে গেল, যেদিন ওর বাবা ওর কাছ থেকে দূরে চলে গেল, যেদিন ওর ভাই-বোন হারিয়ে গেল ওর জীবন থেকে। এই ছেলেটা ওর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল, তাকে হারাবার জন্যে হারাতে হবেই ভেবে ওর বুকের মধ্যে তেমনই যন্ত্রনা শুরু হয়ে গেল।

পূরো দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। রশীদ নিজেদের বাড়ীর উঠোনে এসে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে

পড়ল যেন তার আর কোন রকম বোধ-শক্তি নেই।

রশীদেরও কিছু বলবার প্রয়োজন ছিল না, পুরোরও কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল না।

ব্রজবাসীনিও যেন এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। পুরোর বুক থেকে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নেওয়া তার কাছেও খুব কঠিন মনে হল।

'জল্‌দি কর, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও তো কাজ কর্মে লাগতে হবে না কি।' রশীদের সঙ্গে আসা লোকেরা রুক্ষ স্বরে বলে উঠল।

ব্রজবাসীনি দুহাত বাড়িয়ে পুরোর হাত থেকে ছেলেটাকে নিয়ে নিল। ছেলেটার কচি মুঠিতে পুরোর ওড়নার একটা ধারও সেই সঙ্গে চলে গেল। পুরোর মনে হলো যেন বাচ্চাটা মুঠো করে ওর হৃদপিণ্ডটাকেও তার সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুরোর ওড়নায় টান পড়তেই লাগল।

ব্রজবাসীনি জোর করে বাচ্চাটার মুঠি খুলে ওড়নাটা ছাড়িয়ে দিল। বাচ্চাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বুঝি বা অজানা হাতের স্পর্শ পেয়েই।

পুরো কেটে ফেলা গাছের ডালের মত দেয়াল ধরে বসে পড়ল। গলির মোড় থেকে বাচ্চাটার তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

সন্ধ্যের আঁধার নেমে আসছে। পুরো তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বুকের কাছে কামিজটা ওর ভিজে গেছে অনেক অনেকখানি। ওর যুগল স্তন থেকে দুধের ধারা বহে গেছে সর্বক্ষণ। পুরোর সেদিকে ততটা খেয়াল নেই। ও কতকটা নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল—ছেলেটা নিশ্চয়ই খিদেতে কাতর হয়ে পড়েছে। সেই জন্যই ওর বুক থেকে দুধের ধারা নেমেছে। ভিজে কামিজটা বদলানোর কথাও ওর মনে রইল না।

রাতে ওদের ঘরে রান্নাবান্না কিছুই হল না, খেলও না কেউ কিছুই।

ছোট জাবেদ যখন সহজ সরল ভাবে প্রশ্ন করে, 'আব্বা ! আমাদের কাকাকে (বাচ্চা) কোথায় নিয়ে গেল ?' কিংবা 'আব্বা !, আমাদের কাকা কবে আসবে ?' তখন পূরো আর রশীদ নিরুত্তরে কেবল ছোট্ট জাবেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, লজ্জা পেয়েই যেন মাথা নীচু করে বসে থাকে।

পূরোর চোখের সামনে কাম্মোর মুখটা ভেসে ওঠে, ওর চোখের ওপর থেকে থেকে ভেসে ওঠে ছোট্ট বাচ্চাটার অনিন্দ্য মুখটা। বুকের ভেতরটা ওর মুচড়ে ওঠে ; স্তন দুটি ভারী হয়ে টন্‌টন্‌ করে ওঠে। তখন ও ভাবে বৃন্তচ্যুত ফুলকে কেনই বা ও গলায় পরে থাকে ? ছিঁড়ে যাওয়া ফুল কলির ওপর জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে কেনই বা তাকে আরও সজীব সবুজ করে তোলে ? সবাই পর ছিল। ওর নিজের জন তো কেউ কখনও হয়ে ওঠে নি। রশীদের মুখটা এখন ওর ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে ; এক রশীদই তো ওর সঙ্গে আছে সর্বক্ষণ। যদিও সকলের সঙ্গে যে ওর সম্পর্ক আজ ভেঙ্গে গেছে তার দায়ভাগ রশীদেরই, তবুও সে-ই তো এখন ওর একান্ত আপন-জন, ওরই সন্তান জাবেদের পিতাও বটে।

তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন সমস্ত গ্রামের লোক একটা কথাই কেবল বলতে লাগল, 'ছেলেটা বাঁচবে না. ছেলেটা তো মরতে বসেছে. ছেলেটার অবস্থা খুব খারাপ; ব্যাস ! আর দু'চার দিনের ব্যাপার. যে দুধটুকু জোর করে খাওয়ানো হয়. সেই দুধটুকুই পরক্ষণে উগড়ে দেয়।'

পূরো দেয়ালে হেলান দিয়ে অসহায় ভাবে কাঁদে, কেবল কাঁদে। ওর স্তনে দুধ জমে উপছে পড়ে বুক ভেজায়, টন্‌টন্‌ করে ব্যথায়, আর ওদিকে, সেই বাচ্চাটা দুধ না পেয়ে মুখটা তার শুকিয়ে উঠেছে। বাচ্চাটার মুখ আর স্তনের দুধের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ঘটে গেছে।

'ছেলেটাকে দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছে, ছেলেটার দম বেরিয়ে যাবে এবার তার অভিশাপ লাগবে।'

'যদি ছেলেটা মরে যায় তো সমস্ত গ্রামের ওপর শনিদেবতার

কোপ পড়বে।'

'আমি তো বাড়ীর কর্তাকে আবার বলছি যে ভালোয় ভালোয় ছেলেটাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছো, ফেরত দিয়ে এসো।'

'আমাদের নিজেদেরও তো বাল-বাচ্চা আছে, কারও অভি-শাপের ফল কখনও ভাল হয় না।'

'আমার মরদ তো কেবলই জেদ করে; আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে অন্যের জ্বালানো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তোমার কি লাভ হবে!'

'শুনতে পেলাম যে ওই ব্রজবাসীনি মেয়েলোকটা কাল রাতে বাচ্চাটাকে ঠাণ্ডা দুধ খাইয়ে দিয়েছে। ব্যাস! তারপর থেকেই ছেলেটা বিগড়োতে আরম্ভ করেছে।'

'আরে ওইটুকু বাচ্চা কখনও মোষের ভারী দুধ হজম করতে পাবে? খেয়েই বমি করতে সুরু করেছে ছেলেটা।'

'না, না, তা নয়। আসলে ছেলেটা কিছুতেই ওই মেয়েলোকটাকে মেনে নিতে পারছে না। জন্মের পর থেকেই যার মুখ দেখেছে এতগুলো মাস, সে জায়গায় অন্য আর একজনকে হঠাৎ করে কি ভাবেই বা মেনে নেবে!'

'বেচারা বাচ্চা! কথা বলে তো বোঝাতে পারে না।'

গ্রামের হিন্দু স্ত্রীলোকদের মুখে মুখে এই রকমই সব কথা। পূরো সব শোনে, প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে আর মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে! ওর ইচ্ছে করে যে ও দৌড়ে ধর্মশালায় চলে যায়, ওই লোকেদের পায়ে ধরে মিনতি করে বলে যে এইভাবে কোন জীব হত্যা আপনারা করবেন না। ছেলেটাকে আমার ঝুলিতে দিয়ে দিন, সে ঠিক হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে উঠবে।

কিন্তু পূরোর সাহস হতো না, পা উঠতো না ওর যেতে। পূরো কখনও আশা করে নি যে ঈশ্বরের পাথরের মত কানে ওর অন্তরের প্রার্থনা পৌঁছে যাবে।

পরদিনও কোন কিছুই ঘটল না।

তারপর হঠাৎ রশীদের বাড়ীর উঠোনে দু'তিন জন লোক এসে

দাঁড়াল।

'এই নাও, এর জান-প্রাণের দায় এখন তোমাদের, যদি বাঁচাতে পারো তো বাঁচাও।' বলে একজন লোক সাদা কাপড়ে জড়ানো, বিবর্ণ প্রায় নির্জীব বাচ্চাটাকে রশীদের হাতে তুলে দিল।

রশীদের ইচ্ছে হলো একবার সপাটে, এক থাপ্পড় মারে লোকটার মুখে আমার ছ'মাসের সেবা শুশ্রূষা, বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তোমরা আমাকে দু'চারটে টাকা দিতে চেয়েছিলে, আর এখন বাচ্চাটাকে প্রায় কবরের মুখে ঠেলে দিয়ে, আমার হাতে গছিয়ে বদান্যতা দেখাতে এসেছো! যাও! যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে যাও এটাকে!'

কিন্তু পুরোর উল্লোসিত মুখের দিকে তাকিয়ে রশীদ সব হজম করে নিতে বাধ্য হলো।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত গ্রাম দেখতে পেলো যে ছেলেটা পুরোদের বাড়ীর উঠোনে সুস্থ-সমর্থ হয়ে খেলা করছে।

রক্তোবাজ

রহিমের বুড়ি মায়ের চোখ দুটো দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। রহিমের এক বউ সাত মাসের একটা অবোধ মেয়েকে রেখে মরে গেছে। দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে আবার শাশুড়ীর পট খায় না তেমন। রহিমের মা নিজের চোখের জন্যই অবশ্য কাঁদে বেশী। বুড়ি কিন্তু এখনও ঘরের দশ কাজে কোন রকম ত্রুটি রাখে না। তুলো দিয়ে সুতো কেটে ট্রাঙ্ক ভরতি করে ফেলেছে সে। মিহি সুতো কেটে নানা জিনিস বানিয়ে ঘর ভরে দিয়েছে। এখনও এই বুড়ো হাতে আনাজ তুলে আনে, কাটে, আটা পেষে, কাপাস তুলো ধাঁদে, ভোর ভোর উঠে দই মন্থনে লেগে যায়। তবু তার পুত্রবধূ নানান খুঁত ধরে কথা শোনায়। বুড়ি তাই ভাবে যে যদি তার দৃষ্টি চলে যায় তাহলে এক ঘটি জল দিয়েও কেউ উপকার করবে না।

রহিমের মাকে এই চিন্তাটাই এখন দিন রাত কষ্ট দেয়। একদিন বুড়ি পূরোকে মিনতির স্বরে বলল যে যদি ও দিন পনের তার সঙ্গে যেতে রাজী হয় তাহলে সে চোখ দুটোর চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করতে পারে। হতে পারে হয়তো তার চোখ সেরে যাবে। আবার আগের মত দেখতে পাবে সব কিছু।

'আম্মা! সেই ওস্তাদ থাকে কোথায়?' পূরো জিজ্ঞেস করল।

'ওস্তাদ নয়, বেটি! একজন বাবলী সে, পীরবাবাদের কাছ থেকে বরদান পেয়েছে। শোনা যায় যে তার দেওয়া পবিত্র পানী দিয়ে রোজ সকালে নামাজ পড়ার পর চোখ ধুয়ে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই চোখ ভাল আর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শুনেছি যে কতলোকের বন্ধ চোখই না কি তাঁর পবিত্র পানী দিয়ে ধোওয়ার পর খুলে গেছে। বাবলীর মাটিও নাকি চোখে লাগায়।

'আম্মা! সেই বাবলী আছে কোথায়?'

'রত্তোবাল গ্রামে আছে। একজন সাঁই ওখানে আছেন। রুগীদের জন্যে সে সেখানে একটা তাঁবু লাগিয়ে দিয়েছে।'

পূরোর কানের ভেতর কেউ যেন একটা শলাকা বিঁধে দিল। রত্তোবাল···রত্তোবাল···ছত্তোয়ানীর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে যে রত্তোবালের দিকে যাবার কাঁচা সড়কের দিকে পূরো সাগ্রহে চেয়ে থাকতো, যে সড়ক ধরে কোনো একজনের পূরোকে নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে আসবার কথা ছিল, যে সড়কের ওপর দিয়ে গ্রামের চারজন কাহারের পূরোকে ডুলিতে বসিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল!···রত্তোবাল···

পূরোর পায়ের দাগে সে পথ ময়লা হয়ে যায়নি, পূরো দুচোখে সে গ্রাম দেখে নি। একটা ভুলে যাওয়া নাম পূরোর স্মরণ পথে উদিত হলো···রামচন্দ···রামচন্দ···

পূরোর ভেতর থেকে কিছু একটা বিস্ফোরিত হয়ে যেন ঠেলে উঠলো, মনের মধ্যে একটা তোলপাড় সুরু হলো, 'একবার তার মুখটা তো দেখে নিই, কেমন ছিল সে দেখতে, একবার তার গ্রামের চেহারাটাকে দেখি, কেমন দেখতে সেটা···'

'আচ্ছা আম্মা! আমি তোমার সঙ্গে যাব।' পূরোর মুখ দিয়ে অনায়াসেই কথাগুলো বেরিয়ে এল। পরক্ষণেই একটু লজ্জিত হয়ে বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। পূরোর মনে হলো বুঝি বা রহিমের মা ওর হৃদয়ের অন্তস্থলের কথাগুলো জেনে ফেলেছে।

'সাঁইয়ের দোয়ায় তোর বাল-বাচ্চারা সুখে থাক, তোর বাড়-বৃদ্ধি হোক, আয়ুষ্মতী হও বাছা!' রহিমের মায়ের আন্তরিক আশীর্বাদ ঝরে পড়ল পূরোর মাথায়। কে জানে, তার মনে বুঝি এই কামনা একবার উঁকি দিয়ে বলে যে কি ভালই না হতো যদি আমার বেটার বউও এমনভাবে মিষ্টি স্বরে কথা বলতো।

'আম্মা! জাবেদের আব্বাকে তুমিই বুঝিয়ে বলে দিও, আমি কিছু বলব না।' পূরো লজ্জিত স্বরে বলল।

'ওই দেখ! আরে সে তো আমার ছেলেই, সে কখনও অস্বীকার করতে পারে! আমার খাতিরে চারটে দিন সুখ-দুঃখে কাটিয়ে দেবে ঠিক।' রহিমের মা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো বলল।

পূরো জানতো যে রশীদ কখনও রহিমের মায়ের কথা অমান্য করে না। কিন্তু তার সামনে রত্তোবালের নামই উচ্চারণ করা ভীষণ কঠিন।

পূরোর মনে সেই রাত্রে নানান পরস্পর-বিরোধী ভাবনা তোলপাড় করতে লাগল ··'সে আমার কে? আমি তো তার দিকে চোখ তুলেও দেখব না। পরপুরুষ, তার গ্রাম দেখে আমি কি পাব··· সে গ্রামে থাকে তো থাকুক না, আম্মা নিজের চিকিৎসা করাবে, তারপর আমরা ফিরে চলে আসব।···তোর মনটাই তো তার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে, তার হয়তো কখনো খারাপ স্বপ্নের মত তোর কথা মনেও পড়েনি একবার···'

পূরো ভাবে, ওই গাঁয়ে পৌঁছলে-রাত হলেই ওর ভেতর থেকে যেন কেউ শায়িত কবর খুঁড়তে আরম্ভ করবে! সেই কবরের মধ্যের লাশটাকে কেউ হয়তো উঠিয়ে ফেলবে। সেই মৃতের কবর খুঁড়ে

তুলে কি লাভ হবে আর ? ও রত্তোবাল যাবে না। ও রত্তোবালের রাস্তা দিয়েই কক্ষনো হাঁটবে না।

পুরো এরপর হ্যাঁ অথবা না কোন কথাই বলে না।

জাবেদ তার বাবাকে কিছুতেই ছাড়ে না। রশীদ তাকে পাঠাল না তাদের সঙ্গে। দুজন স্ত্রীলোককে পৌঁছবার জন্য রহিমের বাড়ীতে কাজ করে—পুরোনো লোক আশরফ সঙ্গে গেল। পুরো ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

আশরফ সামনে এক্কা ওয়ালার পাশে বসল। জিনিসপত্র সব পেছন দিকে রেখে পুরো আর আম্মা মুখোমুখি হয়ে বসল। এক্কা চলতে আরম্ভ করতেই পুরোর ছেলে ওর কোলেই শুয়ে পড়ল।

সামনের দিকে বসে থাকা আশরফ পুরোর ছেলেটাকে কোল থেকে তুলে নিল। এক্কা রত্তোবালের সড়ক পথ দিয়ে চলতে লাগল।

ঘোড়ার নাল-পরা পায়ের টক্‌টক্ শব্দ পুরোর মাথার ভেতর যেন হাতুড়ি পেটাতে লাগল। পুরো এক্কার একদিকের উঁচু বাজুর ওপর নিজের মাথাটা এলিয়ে দিল। শরীর ছেড়ে দিল ও।

…খুব সুন্দর করে সাজানো একটা ডুলির মধ্যে চাঁদির ঝালরে ঢাকা একটা বালিশে মাথা রেখে পুরো শুয়ে আছে। চুড়ির বোঝাতে ও যেন ওর হাতদুটো ভাল করে তুলে নাড়তেও পারছিল না। বাতাসের এক ঝাপটাতে ডুলিটার একদিকের পরদা একটুখানি সরে গেল। তখন সেই মৃদু আলোকরেখাতে ও দেখতে পেলো যে ওর হাতে মেহেদীর রঙ একেবারে ঝলমল করছে। কত যে মেহেদী ছিল, পুরোর সখীরা বুঝি সবটাই ওর হাতে পায়ে এঁকে এঁকে দিয়েছে। ওই কাহারগুলো কি দুষ্ট, কেমন করে ডুলিটা চালাচ্ছে দেখ। ডুলিতে বসে বসে পুরোর কোমর ব্যথা করছে, কি বিশ্রী ভাবে যে ডুলিটা দুলছে! পুরোর মাথার ওপর থেকে ঘোমটা সরে গেছে। ও হাত উঠিয়ে ঘোমটা ঠিক করে দিল। হাতের চুড়ি-বালাগুলো ছনছন্ করে সমস্ত ডুলির মধ্যে গুঞ্জরণ তুলল। পুরোর

বুকের মধ্যেটা কেমন কেমন করছিল। কাল থেকে ও কিছুই খেতে পারে নি। পূরোর মা মিষ্টি দেওয়া ছানার একটা দলা ওর সঙ্গের ঝুলিটাতে দিয়ে দিয়েছিল। ওর একবার ইচ্ছে হলো যে একটু ভেঙ্গে মুখে দেয়, কিন্তু ওর মনটা কিছুতেই কেন যে স্থির হচ্ছে না···

আম্মা পূরোর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, 'ওই দেখ, দুপুর ঠিক মাথার ওপর এসে বসেছে, একটু কিছু মুখে দে!'

এক্কাওয়ালা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল এক্কাটাকে। রাস্তায় একটা ছোট্ট গ্রামের কাছে কিছু খেয়েটেয়ে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল তারা। পূরো থরথর করে কেঁপে উঠেই জেগে গেল। না কোন ডুলি ছিল, না গহনা গাটি আভূষণ ছিল, না ছিল মেহেন্দী, না ছিল চূড়া। পূরো একবারে পেছন দিকে আম্মার সামনে বসেছিল।

পূরো রাস্তায় খাবার জন্য ঘি-মাখানো পরোটা বানিয়ে রেখেছিল। আম্মা সেই পুঁটলীটাই খুলল। আশরফকে চারটে দিল, এক্কাওয়ালাকে দিল, নিজে নিল, তারপর পূরোর সামনে বাকীটা রেখে দিল।

পূরোর গলা দিয়ে যেন টুকরোগুলো নামতে চাইছিলো না। পরোটাতে মাখানো ঘিয়ের গন্ধে যেন ওর ভেতর থেকে সব উঠে আসতে চাইছিল।

'আর সামান্য রাস্তা বাকী আছে, তাড়াতাড়ি করে নাও। রাতে ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিয়ে সকালেই আমাকে ফিরতে হবে।' এক্কাওয়ালা বলছিল। এরপর সব সওয়ারীরা এক্কাতে উঠে বসল। পূরো নিজের মাথা ফের এক্কাটার ধারের বাহুর ওপর রেখে আরামের ভঙ্গীতে শরীর এলিয়ে দিল! পূরো রাতভর জেগে জিনিসপত্র যা যা নেবার মোটামুটি সব বাঁধাছাদা করেছিল। ফলে গতরাতে ওর ঘুম হয়ই নি।

···ডুলিটা আবার দুলতে আরম্ভ করেছে। রত্তোবালের রাস্তা যেন আর কিছুতেই শেষ হবে না। দেখতে দেখতে কতরকম বাজনা আর সানাইয়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ডুলির এদিক ওদিক

চারপাশে বাজনা বাজছিল। পুরোর মনে হলো বুঝি রত্তোবাল এসে পড়েছে।···বাজনা আরো জোরে বাজতে আরম্ভ করেছে··· মেয়েরা সব গান গাইছে সমবেত স্বরে···একজন স্ত্রীলোক এসে তার ঘোমটা তুললো···তারপর কেউ একজন ছোট্ট একটা ছেলেকে ওর কোলের ওপর ফেলে দিল। ছেলেটা অপরিচিত কোলে এসে কাঁদতে আরম্ভ করল, স্ত্রীলোকেরা সব খিলখিলিয়ে হাসছিল, আর ও ছেলেটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল···

আম্মা ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, 'আজ দেখছি তোর বড্ড ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, দেখ, ছেলেটা কাঁদতে আরম্ভ করেছে।'

পুরো আবার শরীরভরা কাঁপুনি দিয়ে জেগে উঠল। একবারে পেছন দিকে বসে আম্মা ওর সঙ্গে কথা বলছে।

'আমাদের এক্কার পাশ দিয়ে কি বিরাট একদল বরযাত্রী গেল, কি তুমুল জোরে নানা রকমের বাজনা বাজল, সেই ভীষণ শব্দেও আপনার চোখ খুলল না?' আশরফ বলছিল।

'তুই তো ঘুমোচ্ছিলি, তার মধ্যেই আশরফ তোর কোলে ছেলেটাকে দিল, তুইও বেশ যত্ন করে কোলে নিলি, তবু তোর ঘুম ভাঙল না···' বলতে বলতে আম্মা হাসতে লাগল।

এক্কা রত্তোবালে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো। যখন বাবলীর (পুকুর) কাছে গিয়ে সকলে এক্কা থেকে নামল তো সামনেই সাঁইয়ের ঘর দেখা গেল। তাঁবুর বদলে এবার সাঁই দু'তিনটে কাঁচা কুঠরী বানিয়ে দিয়েছে, যে গুলোতে দূর দূর থেকে আসা যাত্রীরা থাকে, থাকতে পারে। বাবলী-পাড়ের মাটি, বাবলীর জল চোখে দিয়ে যায় যা কিছু মনে আছে কামনা করে।

সাঁই এই নতুন যাত্রীদের জন্য একটা কুঠরীর বন্দোবস্ত করে দিল। আশরফ সমস্ত পুঁটলীগুলো কুঠরীর মধ্যে রেখে দিয়ে আম্মাকে নিয়ে সাঁইয়ের কাছে চলে গেল। পুরো কুঠরীর ভেতরে রাখা চারপাইটার ওপর খেস্ বিছিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে শুইয়ে দিল। তারপর ও দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সামনে বিস্তৃত ক্ষেতের ওপারে

গ্রামের ঘর-বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

…আমি রত্তোবালে এসে গেছি, কেউ আমাকে ডেকে নিল না, আমাকে নিতে একজন লোকও এল না, কেউই তো সানাই বাজাল না, কেউ তো গানও গাইল না, আমার হাতে কেউই চুড়ি পরিয়ে দিল না, একটা কড়িও তো আমার হাতের মুঠোতে ছনছনিয়ে বেজে উঠল না, মেহেন্দীর একটা দাগও আমার হাতের চেটোতে লাগানো হল না…

গ্রামের সীমার বাইরে এই বাবলীর চারপাশে গভীর নির্জনতা।

পূরোর হৃদয় উড়ে যেতে চাইল। ওর মনে হচ্ছিল যে দৌড়ে ও ঐ গ্রামের মধ্যে চলে যায়, এখান থেকে পালিয়ে যায়। থেকে থেকে ওর মনের মধ্যে কেবলই প্রশ্ন জাগছিল, ঐ গ্রামের লোকগুলো কেমন ধারা। কেউ ওকে বলল না, 'বসে পড়ো,' কেউ ওকে বলছে না, 'জীতি রহো—বেঁচে থাকো!' কেউ ওকে বলছে না…

এবার পূরো কিছুটা সামলে নিল নিজেকে। হঠাৎ ওর মনে হলো বুঝি বা পাগল হয়ে যাবে ও। কখন আবার সেই পাগলীটার মত গাঁয়ের রাস্তা, গলি দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ না করে, নিজের পরনের কাপড়টা না আবার ছেড়ে ফেলে, আবার না তার মত চিৎকার করে বলতে সুরু করে…

সাঁই আম্মাকে বলল যে তাকে সেখানে ঠিক তেরোদিন থাকতে হবে। তার চাকর গতদিন তাদের গ্রাম সক্কড়আলীতে চলে গেছে। আটা ডাল তারা নিজেরা সঙ্গেই এনেছিল। পূরো আর আম্মা নিজেদের রুটি নিজেরাই তৈরী করে নিত। যদিও কেউ যদি ইচ্ছে করে তো সাঁইয়ের দরগা থেকেও ভোজন করে আসতে পারে।

পূরো গাঁয়ের দিকে একবার মুখও ফেরালো না। তাছাড়া, গাঁয়ের ব্যাপারে সে কাকে জিজ্ঞেস করবে বা কি জিজ্ঞেস করবে? দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। গাঁয়ে যদি সে যেতে চায় তো কোন্ ছুতো করে যাবে? যদি কোন জিনিসের দরকার পড়তো তো সাঁইয়ের নোকর চাকরাই এনে দিয়ে যেতো।

এই ভাবনাটা ভাবতে ওর পীড়া বোধ হতো, মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো যে ও গাঁয়ের চৌকাঠে পা রেখেও গাঁয়ের ভেতরটা একবার দেখতে পাবে না। পূরোর মনে হতো যে কোন না কোন ভাবে একবার গ্রামে গিয়ে সমস্ত গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখে আসে, তার ঘরটা দেখে আসে, তাকেও দেখে আসে একবার, কিন্তু কেউ যেন ওর পরিচয় না জানতে পারে···তারপর পূরো আবার ভাবে যে ও কি করে চিনবে যে কোন্ বাড়ীটা ওর নিজের বাড়ী হতে পারতো, কাউকে যে জিজ্ঞেস করে জানবে তো কি বলবে তাকে, তাছাড়া সেই ঘরের ভেতরের চেহারাই বা কি করে দেখবে···আবার পরক্ষণেই পূরো ভাবে, তার ঘর-বাড়ী দেখেও বা তার কাছ থেকে কি আর পাবার আছে, ওরই বা সেই ঘরের সঙ্গে এখন আর সম্বন্ধ কি, কেন খামোখা ওর মনের মধ্যে এইসব ভাবনা-চিন্তা গুলো জাগছে···

পূরোর মন যেন কিছুতেই স্থির হতে চাইছিল না। একের পর অন্য আর একটা দিন এই ভাবে কেটে যাচ্ছিল। বসে বসে পূরোর মনের মধ্যে একটা ভুলে যাওয়া গান জেগে উঠল :

জয়ে আয়ে তয়ে দূরে চল্লে
সাডে আয়াঁ দা কদর নয়ী
হায় রব্বা, সাডে আয়াঁ দা সবর পবী।

বার বার কতবার পূরোর দুটি চোখ জলে ভরে ওঠে, আর নিজেই সব যেন পান করে নেয়। ছেলেটাকে আম্মার পাশে শুইয়ে দিয়ে ও ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আসে।

পূরো ভাবে, একবার দেখতে পেলেই তো চিনে নেবে ও।

আবার সে ভাবে, এতগুলো বছর হয়ে গেল, কে জানে তার চেহারাই বা না জানি কেমন হয়ে গেছে। যদি আমার পাশ দিয়ে চলেও যায়, তো আমি কি সত্যিই তাকে চিনে নিতে পারবো!'

ক্ষেতে গিয়ে কখনও কখনও চাষীদের ও জিজ্ঞেস করে, 'ভাই! এই ক্ষেত কাদের। দুটো গাজর নিতাম, আমরা তো এখানে যাত্রী হয়ে এসেছি।' চাষীরা কখনও এর নাম, কখনও তার নাম করতো,

কিন্তু রামচন্দ্রের নাম কেউই করতো না।

পরে একদিন কেউ একজন সত্যি সত্যিই রামচন্দ্রের নাম করল। পুরোর পা দুটো এমন ভারী হয়ে গেল, যেন মাটিতে বসে গেল।

পুরোর মাথা ঘুরতে লাগল। ওর মনে হলো, সে সেখানেই মাটিতে আছড়ে পড়বে ; ও সেই মাটিতেই মাটি হয়ে মিশে যাবে…

পুরো সেইখানেই, দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই রইলো। ওর পা দুটো থেকে সমস্ত শক্তি যেন কে শুষে নিয়েছে। ওর পা দুটো যেন জমে গিয়ে দুটো বরফের শক্ত ঢেলা হয়ে গেছে। ওইখানকার মাটি যেন ওকে একেবারে ক'সে ধরে ধরে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে।…

পুরোর বোধ হল যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ও একটা আনারফলের গাছ হয়ে মাটি কুঁড়ে বেরিয়েছে ; যে গাছের আনার যখনই কেউ পেড়ে নিতে আরম্ভ করেছে, তখন সেই আনারটা জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে মাটির বুকের ওপর গিয়ে পড়ছে, সেই লালরঙের আনার যখনই রামচন্দ্র ভাঙ্গে তো আনারের লাল লাল দানাগুলো এক এক ফোঁটা রক্ত হয়ে হয়ে তার জামা কাপড়ের ওপর গিয়ে পড়ে। আর সে সেই আনার গাছের মধ্য থেকে ভেসে আসা একটানা স্বর শুনতে পায় :

ম্যঁয় বুটা উগ্ গী হোই আঁ
ম্যঁয় বে মুরাদী মোয়ী হাঁ

কিষাণেরা ছোলার গাছ কেটে এক একটা বোঝা করে বেঁধে নিয়ে মাথায় তুলেছে। তখন পুরোর ধ্যান ভাঙ্গল। ওর তখন মনে পড়ল যে রাজকুমারী আনারের গাছ হয়ে মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল তার কাহিনী ও অনেক ছোটবেলায় কার কাছে যেন শুনেছিল। পুরো তো এখনও কোন রাজকুমারী হতে পারে নি, তাই আনারের গাছও হতে পারেনি।

'মালিক আসছেন…' বলে চাষী লোকটা ছোলাগাছের বোঝা নিয়ে কূয়োর দিকে চলে গেল।

পুরোর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ধারা বহে যেতে লাগল। রামচন্দ্র যখন

পুরোর পাশ দিয়ে চলে গেল, তার চোখ একবার পুরোর ওপর পড়ল। পুরোর মুখ অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছিল। -

পুরোর কিছুই মনে পড়ল না, আঁচল দিয়ে চোখ ছুটি মুছে ফেলার কথাও মনে পড়ল না। বোধহয় চোখের জলের ঝাপসায় রামচন্দের মুখটাও ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না।

'তুমি কে গো, বিবি? কি হয়েছে তোমার?' রামচন্দের পা ছুটো থমকে দাঁড়াল।

পুরো কিছুই বলতে পারলো না।

'তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে, বিবি?' পুরোর কানে আবার রামচন্দের গলার স্বর বাজল। পুরোর জিভ যেন মুখের ভেতরেই কে টেনে ধরেছিল। ও মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে রইল। পুরোর মনের ভেতরটা তোলপাড় করে যেন বন্যা সুরু হলো, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হতে চাইল না।

রামচন্দ ঘাবড়ে গেল। সে এদিক ওদিক তাকালো। বোধ হয় সে কোন কিষাণকে সাহায্যের জন্য ডাকতো। সেই মুহূর্তে পুরোর পায়ে যেন শক্তি ফিরে এল আর ও সেইরকম চুপচাপ, গুমসুম হয়ে, একটা কথাও না বলে, ক্ষেত থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

পুরো চুপচাপ এসে নিজের কুঠুরীতে পড়ে রইল। সেদিন বিকেলেই সক্কড়আলী থেকে আশরফ চলে এসেছিল। পরের দিনটি কাটিয়ে তাদের সবাইকে গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে।

সেই রাতে পুরোর ছু'চোখের পাতা এক হলো না। একটা শব্দও আমি তাকে বললাম না···জিজ্ঞেস করছিল, তুমি কে গো, বিবি।—আমি তাকে কি বলব যে কে আমি?—আমার ব্যথাকে মুখে বলে কে পারে বোঝাতে!—কখনও শুয়ে, বসে, উঠতে গিয়ে আমার কান্নাভরা মুখটা তার মনে পড়লে সে তখন ভাববে যে ঐ বিবি কে ছিল—তারপর, কে জানে, তার হয়তো মনে পড়ে যাবে কোন ভুলে যাওয়া কাহিনী—তার মরে যাওয়া পুরোকে তখন মনে পড়ে যাবে—তখন হয়তো তার ছুচোখ বেয়ে ছু'এক ফোঁটা অশ্রুজল গড়িয়ে

পড়বে—।…আবার পূরো ভাবে 'যদি আমিও সেই রাজকুমারীর মত আনারের গাছ হয়ে যেতে পারতাম, তার ক্ষেতের মাটি ভেদ করে বেড়ে উঠতাম, সে আমার আনার ফল পাড়তো, তখন আমি আনারের ভেতর থেকেই বলে উঠতাম—কি জানি এসব কোন্ সে যুগের কথা—আজকাল তো আর কোন মানুষ সত্যিই গাছ হয়ে যায় না…'

রাতের শেষ প্রহর এখনও ভোরের দিকে পৌঁছয় নি তবু কে যেন পূরোর হাত ধরে তাকে চারপাই থেকে উঠিয়ে দিল। পূরো বাইরে ক্ষেতের দিকে চলে গেল। রাতের অন্ধকারেও পূরো সেই জায়গা ঠিক চিনে নিল, যেখানে কাল সাঁঝের বেলা রামচন্দ্র ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুঁকে পড়ে পূরো সেই জায়গা থেকে তার চরনের ধূলো তুলে নিল, তারপর চোখ বন্ধ করে এক চিমটি নিজের চোখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিল।

চোখের সঙ্গে লাগানো পূরোর দুটি হাত কেউ একজন তার হাত দুটি দিয়ে চেপে ধরল। পূরো চমকে চোখ খুলে দেখল রামচন্দ ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'তবে কি সত্যিই সেই পূরো ?' রামচন্দ প্রশ্ন করেছিল, 'সারাটা রাত এই এক নাম আমার মাথায় পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সত্যি করে বল, তোমার নামই তো পূরো ?'

পূরোর হৃদয়ের ভেতর থেকে বারে বারে ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ও এখনই, এই মুহূর্তে, রামচন্দের দুটি পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রাণ ভরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ও-ই পূরো, আমিই তোমার সেই পূরো, পূরো নামের সেই হতভাগীনি যে তোমার হ'তে গিয়েও হ'তে পারল না; চিৎকার করে বলে যে আমিই সেই পূরো যাকে তোমার ঘোড়ায় চড়ে, বর সাজে সেজে বরণ করে নিয়ে আসবার কথা ছিল, যার সঙ্গে তোমার অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়ার কথা ছিল। এই সেই পূরো যার তোমার ঘরে ডুলিতে চেপে রাণীর মত আসবার কথা ছিল…ও সেই পূরো, হ্যাঁ, আমি তোমার

সেই পুরো…

পুরোর জিভ আজও, এই মুহূর্তে কে যেন ভেতর দিকে টেনে ধরেছিল। পুরো একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। রামচন্দ্রের দু'হাতের মুঠোর ভেতর থেকে নিজের দু'টি হাত ধীরে ধীরে টেনে ছাড়িয়ে নিল পুরো। তারপর আগের মত তেমনই ভাবে, চুপচাপ, নিজের কুঠুরীর দিকে ফিরে চলল।

'যদি তুমি সত্যিই সেই পুরো হও তো একবার, একটিবারের জন্যে আমাকে বলে যাও!' রামচন্দ্র পুরোর পেছন পেছন দ্রুত পায়ে আসতে আসতে মিনতি জানাল, 'আমি সারা রাত ধরে এই ক্ষেতের মধ্যে কেবলই ঘুরে বেড়িয়েছে। কেন, আমি জানি না, আমার মন বার বার কেবলই বলছিল যে তুমি আবার আসবে, নিশ্চয়ই আসবে, কেন না আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জেগে উঠছিল যে তুমিই পুরো, তুমি পুরো ছাড়া আর কেউ নও!'

'পুরো তো কবেই মরে গেছে!' না জানি কিভাবে পুরোর মুখ দিয়ে কথা কটা বেরিয়ে গেল। ও তারপর পেছন ফিরে তাকাল না। সামনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল।

আম্মা পবিত্র বাবলীর সাঁইকে মিষ্টি উপচার দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানাল। তারপর আম্মা এবং বাকী সব সঙ্গীদের নিয়ে রোদ্দুর ওঠার আগেই একাটা সক্কড়আলী গ্রামের পথের ওপর এসে পড়ল।

একটুকরো আগুন

এক এক দিন করে কতদিন বহে গেল, দিনের পর দিন যেতে যেতে কয়েকটা মাস, তারপর মাসের পর মাস কেটে গিয়ে কতগুলো বছরও পার হয়ে গেল।

দুধ ভর্তি কড়াই উনুনের ওপর বসিয়ে জ্বাল দেবার জন্যে শুকনো গোবর মাটি মেশানো ঢেলাগুলো উনুনের মুখে গুঁজে দিতে দিতে

যখন সারাদিন ধরে সেগুলো ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে, তখন পূরো অনুভব করে যে ওর বুকের ভেতরও একটুকরো কয়লার আগুন না জানি কতদিন ধরে জ্বলতে জ্বলতে ওর অন্তস্থলে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরী হয়ে গেছে, এবং সেটা জ্বলছে, জ্বলছেই।

আজকাল ওর কি যে হয়েছে, সময় সময় মনে হয় যা কিছুই ও খায় কিছুই যেন ওর বুক বেয়ে নামে না, গলার নীচে গিয়ে বুকের কাছেই সব জড়ো হয়ে থাকে। গলার কাছটা সব সময়ই কেমন বাধো বাধো ঠেকে। দু'তিন বার বাসী জলের সঙ্গে চিম্‌টি চিম্‌টি করে জোয়ানের আরকও খেয়েছে। কোন লাভ হয় নি। পূরোর কখনো কখনো তাই মনে হয় বুঝি বা আমার শরীরের ভেতরটা খুব গরম হয়ে গেছে। তিন চার লোটা ভরে ভরে কাঁচা লস্যি (মাঠা) খেলো। কিছুটা উপশম হয় কি না হয় তখন আবার অন্য কথা মনে আসে। কে জানে মায়ের শরীরটা কেমন আছে। কেন এরকম চিন্তা ভাবনা ওর মনে জাগে তার খেই ধরতে পারে না।

এরই মধ্যে একদিন যখন রশীদ ঘরে ফিরল, তার মুখের চেহারা তখন এমনই বিষণ্ণ এবং চিন্তাচ্ছন্ন যে মাসাধিক কাল ধরে সে রোগে ভুগে উঠেছে।

ঘরে এসে কিছুই বলল না রশীদ। পূরোর সঙ্গে কথাবার্তা বলল, জাবেদের মাদ্রাসাতে কেমন পড়াশোনা চলছে তা জানতে চাইল, ছোটছেলের সঙ্গে হাসি-খেলায় মেতে থাকলো। খাবার সময় পূরো রশীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। পূরোর মনে হলো যে গ্রাসগুলো যেন রশীদের গলা দিয়ে আর নামছে না। জলের সঙ্গে ঢোঁক গিলে গিলে ক' গ্রাস খাবার কোন মতে যেন গলার নীচে ঠেলে দিল। রশীদের মনের অবস্থা পূরোর কাছে বুঝি অজ্ঞাত রইল না। কিন্তু বিষয়টা কি সে সম্বন্ধে ধারনাও কিছু করতে পারল না ও।

পাশাপাশি দুই চৌকির ওপর শোওয়ার পর পূরো রশীদের কাছে জানতে চাইল যে তার শরীর খারাপ কি না।

'আজ আমাদের গ্রাম থেকে একজন এসেছিল, আমাদেরই ক্ষেতে কাজ করে সে।' এক পলের জন্য চুপ করে থেকে শেষে রশীদ বলল।

'ছত্তোয়ানী থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'সে বলছিল যে আমাদের ফসল কেটে স্তূপাকৃতি করে রাখা ছিল। নিয়ে আসার আগে যেমন রাখা হয়। মন মন আনাজ স্তূপ করে করে সাজান ছিল···'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'কেউ রাতের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

'অ্যাঁ!'

'সমস্ত ফসলের মধ্য থেকে একটা দানাও বাঁচে নি।'

'কেউ জেনে-বুঝেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে?'

'সে রকমই তো সন্দেহ হয়।

'কে এমন লোক সে?'

'আমাদের সেই লোকটা বলছিল, আগুনের লকলকে শিখায় সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে গেছল।'

'তাহলে এখন! আমাদের যেটুকু ভাগ ছিল সে তো গেলই, বাকী যাদের সে বেচারারা এখন কি করবে?' পূরো রশীদের অন্য ভাই, চাচা আর তাউদের, যাদের ফসলের ভাগ ছিল, তাদের কথা ভেবেই কথাগুলো বলল।

রশীদ একেবারে চুপ হয়ে গেল। পূরোও খুবই চিন্তায় পড়ে গেল। ছেলে দুটো তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু রশীদ আর পূরোর চোখে ঘুম নেই।

'কিন্তু অন্যের ঘর জ্বালিয়ে কার কি উপকার হল?' পূরো কতবার যে কথাগুলো মনে মনে ভাবল। রশীদও চুপ করেই রইল। পূরো লক্ষ্য করল, কখনও ডান পাশ ফিরে শুচ্ছে রশীদ, কখনও বাঁ পাশ ফিরে, তারপর আবার চিত হয়ে পড়ে থাকছে। ছটফট

করছে। কখনও কখনও জোর করে চোখ দুটো বুঁজে চুপটি করে পড়ে থাকছে। কিন্তু ঘুম তার কাছ দিয়েও যেন হাঁটতে চাইছে না। বার কয়েক উঠে রশীদ ঢকঢক করে জলও খেলো।

'ছেলেটাকে অন্য খাটে শুইয়ে দাও। আজ আর ওর কাছে শুয়ে আমার ঘুম আসছে না।' রশীদ বলল।

জাবেদ বরাবরই আব্বার সঙ্গে শুয়ে থাকে আর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে পুরো শোয়। আগে কখনও রশীদ এমন কথা বলে নি। পুরো তো অবশ্যই আশ্চর্য বোধ করল কিন্তু ও চুপচাপ জাবেদকে উঠিয়ে আলাদা চৌকিতে শুইয়ে দিল।

তারপর কত সময় চলে গেল। রশীদ কেবলই এপাশ ওপাশ করতে লাগল। কিন্তু ঘুম ওর চোখের ধার দিয়েও এল না।

'একটা উড়ো উড়ো কথা শুনতে পেলাম, জানিনা সত্যি না মিথ্যে।' রশীদ শুয়ে থেকেই কথাগুলো বলল।

'কি ? কি কথা ?' পুরো একটু চমকে উঠে বলল।

রশীদ আবার চুপ করে গেল। যেন নিজের মনে মনেই নির্ণয় করে নিচ্ছে যে কথাটা পুরোকে বলা উচিত কি অনুচিত।

অনেকক্ষণ রশীদ চুপ করেই রইল। পুরো শেষে নিজের খাট থেকে উঠে রশীদের খাটের একপাশে গিয়ে বসল।

শুনলাম গাঁয়ে একজন অপরিচিত জোয়ান ছেলে এসেছিল। ছেলে নয়, যুবকই। সে কারো সঙ্গেই বড় একটা মেলামেশা করে নি। গাঁয়ের লোকদের সন্দেহ যে হয় তো সে-ই···সে হলো তোমার ভাই।'

'আমার ভাই ?' পুরো যেন অনায়াসেই উচ্চারন করে ফেলল।

'ঠিক ঠিক বলা অবশ্য যাচ্ছে না। আমি তো গাঁয়ে গেছি সেই কবে-কতদিন আগে। সেই যে লোকটা এসেছিল আমাদের, সেই সব বলছিল।' বলে রশীদ আবার চুপ করে গেল।

পুরোর মাথার ভেতর বার কেমন যেন পাক খেতে পাগল।

'আমার ভাই ?'···আমার ভাইটা তো এখন নিশ্চয়ই জোয়ান

হয়ে গেছে। ওর মুখটা শেষবার দেখেছি যখন তারপর থেকে তো দশ বারোটা বছর পার হয়েই গেছে। কে জানে এখন তাকে দেখতেই বা কেমন হয়েছে। যদি হঠাৎ এখন দেখা হয়ে যায় তাহলে তো চিনতেও পারবো না। নিশ্চয়ই ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা ভালভাবেই দেখা দিয়েছে। ন'দশ বছর তো এই জাবেদেরই বয়স হয়ে গেল। পুরোর মনে নানা রকম চিন্তার তরঙ্গ যেন মাকড়সার জাল বোনার মত কেবলই জটিল গ্রন্থি পাকাতে লাগল।

রশীদ কেবল পুরোকে এইটুকু আরও বলল যে পুরোদের বাড়ীটা সম্পর্কে সে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ঐ বাড়ীটা কাদের, কিন্তু সে নিজের সম্বন্ধে নিজের মুখে কাউকেই কিছুই বলে নি। লোকেরা কেবল সন্দেহই করেছে। নিজেদের কানে তাদের কেউই কিছু শোনে নি।

তবে কি সত্যিই সে গাঁয়ে এসেছিল? আমার কথাও কি তার মনে পড়েছিল, তার বোন, তার নিজের বোন, তার আপন মায়ের পেটের বোন···!

পুরোর মনের ভেতরটা তোলপাড় করতে লাগল। দুচোখ বয়ে অশ্রু নেমে এলো ওর।

তখন ওর আগুন লাগার জন্য দুঃখ বোধ রইল না। জ্বলে যাওয়া গমের ছাইয়ের মধ্যে থেকে মায়ের পেটের ভাই বোনের জন্য স্নেহধারা উথলে উঠতে লাগল। ভালবাসার এক উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ ওর বুকের মধ্যে ঝকঝক করতে লাগল।

কে জানে যে আগুন লাগিয়েছে হয় তো নিজের বুকের মধ্যে সঞ্চিত আক্রোশের প্রতিশোধ নিতেই! তার যুবক শরীরে নতুন তাজা রক্ত ধারা বহে যাচ্ছে হয়তো। কে জানে বোনের দুঃখের কথা মনে করে বুঝি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে···একবার যদি আমি তার মুখটা দেখতে পেতাম! কে জানে আমার ভাগ্যে কি লেখা আছে! —এই ভাবেই পুরো ভাবতে থাকে।

তারপর আবার ওর মন চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ

আগেও যার ভাবনার সঙ্গে ওর নিজের ভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছলো, যার মন মন শস্যদানা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে ও নিজেও দুর্ভাবনায় একাত্ম বোধ করেছিল, এখন, এই মুহূর্তে আবার ওর মন সেই অদেখা জনের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করল যে হয়তো সেই শস্যদানার পাহাড় জ্বলিয়ে ছাই করে দিয়েছে।

'আগুন হয়তো সে লাগায় নি!...নিশ্চয়ই অন্য কেউ একজনই আগুন লাগিয়েছে, কিন্তু নিছক সন্দেহের বশে সেই বুঝি ধরা পড়ে গেল!...পূরোর মনে চিন্তার বোঝা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। যা কিছুই হোক বা ঘটুক না কেন, ও তো ওর ভাইয়ের কুশলই চায়। ও ভাবতে থাকে, কে জানে যে ওর ভাইয়ের বুকে দুঃখ এবং ভালবাসার কোন আগুন জ্বলছে কি না, সেই জ্বলন্ত আগুনের থেকেই একটা স্ফুলিঙ্গ তুলে নিয়ে সে ক্ষেতে ফেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কিনা। হয়তো ওর ভাই জানেই না যে রশীদ আর ছত্তোয়ানীতে থাকে না।

পূরো ক্লান্ত মনে নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। নানা চিন্তার ঢেউ ওর মনের সায়রে কেবলই উঠতে পড়তে লাগল।

পূরোর চোখ দুটি যখন বুঁজে এল—ওর চোখের সামনে তখন আগুন, কেবলই আগুন জ্বলছে; নীচে মাটির বুকের ঘাষ-তৃণ-লতা থেকে অশত্থের উঁচু ডলের ডগা পর্যন্ত কেবলই আগুন জ্বলছে সর্বদিকে। তখন পূরো স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলো, এক সুন্দর নবযুবক আগুনের লক্‌লকে শিখার সুউচ্চ সীমানার ধারে বসে দু-হাত বাড়িয়ে তাপ নিচ্ছে।

পূরো চমকে জেগে উঠল। ওর প্রতিটি অঙ্গের কোষে কোষে একটা ব্যথা গুমরে উঠতে লাগল।

পূরো অনুভব করলো, এই যে এতদিন ধরে বুকের মধ্যে ওর অনবরত ধ্বক্‌ধ্বক করেছে, যার জন্যে ও কখনও জোয়ানের আরক খেয়েছে কখনও বা খেয়েছে ঘটি ঘটি মাঠা (কাঁচা লস্যি!) কিন্তু বুকের ভেতর সেই অগ্নিদাহের কিছুমাত্র উপশম না হয়ে আজ সেই

অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সমস্ত শরীরটাকে ওর জ্বালিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তবুও পুরো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে এই আগুন ওর শরীরটা জ্বালিয়েই দিচ্ছে না আরামের উত্তাপে স্নিগ্ধ করছে, কিংবা ওর ভাইয়ের স্নেহই উজ্জ্বল জ্যোতির রূপ ধরে উদ্দীপ্ত করছে ওকে।

১৯৪৭

যে ভাবে ফুটি ফেটে ফেটে যায়, সেই ভাবে শহরে, গ্রামে মানুষেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

যেমন হাওয়ার সঙ্গে মিশে ধূলো উড়ে উড়ে আসে, তেমন ভাবেই আসপাশের এলাকা থেকে খবর আসছিল। মানুষের পর মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে, ঘরের পর ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীরাই মেরে ফেলছে। পথ দিয়ে চলতে চলতে পাশের মানুষই পাশের মানুষটির মাথা তরোয়ালের এক এক কোপে নামিয়ে দিচ্ছে। মানুষের প্রাণ আর সুরক্ষিত নয়, তাদের ধন সম্পত্তিও নয় সুরক্ষিত।

পুরো সব নিজের চোখে দেখছিল, নিজের কানে শুনছিল। ওর নিজের গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামেও লোকেরা সব অস্ত্রশস্ত্র মজুত করছিল, পুরোনো অস্ত্রের জং তুলে নতুন করে শান দিয়ে নিচ্ছিল। নিজের নিজের বাড়ীর ছাদে ইঁট পাথর জড়ো করে রাখছিল। বল্লম বা বর্শাগুলো সব সাবধানে ঘরের মধ্যে জড়ো করে রাখছিল।

'এখানে আমাদের নিজেদের রাজত্ব, আমরা নিজেরা এখানে শাসন করব,' প্রত্যেকটি মানুষের মুখে এখন এইসব কথা। 'এখানে আমরা হিন্দুদের চিহ্নও রাখতে দেব না,' লোকেরা সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে বলতে থাকে।

'এমন কথা আগে কেউ কখনও শুনেছে!' বার বার পুরো নিজের মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করে। 'ভালরে ভাল, এই সৃষ্টির মানুষ,

এরা সব কোথায় যাবে ?' পুরো কেবলই থেকে থেকে ভাবে, ভাবতেই থাকে।

'লোকেরা খামোখা এত আশঙ্কায়, উল্লাসে লাফালাফি করছে,' পুরো বললো, 'এ সব চারদিনের আঁধি-তুফান, আসবে আর চলে যাবে।'

'কিন্তু লোকেরা সব যেন সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে ; মুখে কেবল খারাপ খারাপ কথা ছাড়া আর কিছুই নেই। কোথাও কোন জায়গা থেকেই ভাল খবর কিছু আসে না। তারপর একদিন পুরো শুনতে পেলো, শহরের গলি গলি দিয়ে রক্তের স্রোত বহে যাচ্ছে, প্রতিটি রাস্তার ওপরই মৃতদের লাশ পড়ে আছে, সেই সব লাশ পচে উঠে গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেগুলো কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে না, কেউ সে সব লাশ তুলে নিয়ে কবর টবরও দিচ্ছে না। লোকেরা সব কেবল বলা বলি করছে যে এত সব লাশের পচা-গলা দেহগুলো থেকে ভীষণ এক সংক্রামক ব্যাধি সারা দেশকে গ্রাস করে ফেলবে।

তারপর সেই বৎসরের পনেরই আগষ্ট পার হয়ে গেল। গাঁয়ে ঢোল-সহরৎ বাজল, চাঁদ আর তারা মার্কা সবুজ পতাকা উড়লো পত্‌পত্‌ করে। প্রতিদিন মসজিদ গুলোতে লোকেদের জমায়েত হয়। গ্রামের হিন্দুদের মুখগুলোতে সব যেন হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে, এমনই বিবর্ণ হয়ে গেছে সব।

এরপর পুরো শুনতে পেলো, কয়েকটা শহরে নাকি সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। সেই সীমার একদিকে মুসলমানেরা সব রয়ে গেল, আর অন্যদিকে সব হিন্দুরা চলে গেল। পুরো আবার শুনলো. ওদিক থেকে মুসলমানেরা সব জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করে বাধা দিতে দিতে কোনক্রমে এদিকে পালিয়ে এল; কতজন যে সেখানেই মরল, আরও কত রাস্তাতেই আসতে আসতে শেষ হয়ে গেল, আবার কতজন এদিকে পৌছবার পরও মরতে লাগল।

এই সব শুনতে শুনতে পুরোর মনে হচ্ছিল বুঝি কান দুটো ওর

ফেটেই যাবে!—ও আরও শুনল যে, মুসলমান হিন্দু মেয়েদের আর হিন্দুরা মুসলমান মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ নিজেদের ঘরে তাদের ঠাঁই দিয়েছে, কেউ কেউ আবার তাদের জানে মেরে দিয়েছে, আবার কয়েকটি মেয়েকে তারা উলঙ্গ করে গলি গলিতে, বাজারে হাটে, প্রকাশ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করাচ্ছে।

গুজরাত জেলার সেই সব গাঁয়ে, যে গুলো পূরোদের গাঁয়ের আশ পাশে অবস্থিত, সেগুলোতে সব চেয়ে পরে এই উপদ্রবের ছোঁয়া লেগেছে। পূরোদের নিজেদের গাঁয়ের লোকেরা, ওর নিজের পাড়া-পড়শী স্বজনেরা, পূরোর কেবল বলতে গেলে রশীদ ছাড়া, রশীদের সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বরাও সব ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পালাবার মনস্থ করতে লাগল। পূরোর সাহস হলো না, আর রশীদেরও সাধ্যে কুলোল না যে তাদের কিছু বলে বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আশ্বস্ত করে।

তাদের আশে পাশের হিন্দুরা পালাতে লাগল। গ্রামে গ্রামে তাদের খুঁটিতে বাঁধা মোষগুলি ভাঁ ভাঁ করে চেঁচাতেই থাকল, ভর-ভরন্ত সাজানো ঘর-সংসার তাদের পড়ে রইল পশ্চাতে, তাদের বুকের রক্ত দিয়ে চাষ করা ক্ষেতগুলো যেন প্রাণ পেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মনিবদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে লাগল। রাতারাতি তারা পালিয়ে বাঁচতে চাইলো, গ্রামের সীমাতেই কেউ কেউ মরে গেল, কেউ কেউ বিশ ত্রিশ ক্রোশ পার হয়ে মরে পড়ে আছে দেখা যেতে লাগল।

পূরোদের গ্রামের সমস্ত হিন্দুরা একটা মস্তবড় বাড়ীতে একত্র হয়ে কোন মতে প্রাণ রক্ষা করতে থাকল ঠাসাঠাসি খাঁচার মধ্যে জন্তু জানোয়ারের মত। যদি কেউ খিড়কি দরজা খুলে বাইরে এসে পড়তো তো তৎক্ষনাৎ মৃত্যু এসে এক ঝাপ্টাতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। ওই বাড়ীটাতে হিন্দুরা খাদ্যসামগ্রী আনাজ পাতি জড়ো করেছিল শোনা গেল। কোন হিন্দুই বাইরের দিকে তাকাতো না বা কোন হিন্দু স্ত্রী উঁকি ঝুঁকি দিত না প্রকাশ্যে।

পুরোদের গ্রামে এখন কেবল মুসলমানেরাই রয়ে গেছে। ওদিকে তো পাশের হিন্দুরা একটা বাড়ীতে বন্ধ। একদিন ওদের গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে সেই বড় বাড়ীটাতে হামলা করল। তারা সব ঠিকই করে ফেলেছিল যে ওই বড় বাড়ীটা সহ সকলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সে জন্যে প্রথমে তারা গ্রামের যত হিন্দু বাড়ী ছিল, সেই সব বাড়ীর তালা ভেঙ্গে ফেলে যে যার মত দখল করে নিয়ে এক একজন মালিক হয়ে বসল। যদি কেউ রাত-বিরেতে বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে কেউ বাইরে আসবার সাহস করতো, পরদিনই পুরো গাঁয়ের রাস্তায় তার লাস পড়ে থাকতে দেখত।

একদিন কি জানি কি ভাবে গ্রামের মুসলমানেরা বড় বাড়ীটার দরজা আর জানালার ওপর তেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল, তারপর সেই তেলে সিক্ত দরজা জানালায় সহজেই আগুনও লাগিয়ে দিল ; সেই সময়েই ট্রাক ভর্তি হিন্দু মিলিটারীর দল ওদের গ্রামে পৌছে গেল।

বাড়ীর ভেতরে তখন আগুনের শিখা যতখানি উঁচুতে লক্‌লক্ করে উঠছে ততখানিই উঠেছে চিৎকার আর কান্নার রোল। দ্রুত হাতে মিলিটারীরা সেই আগুন নেভালো এবং ভিতর থেকে মানুষ জন বার করে করে আনল। আতঙ্কিত সেই সব বাসিন্দাদের তারা ট্রাক-লরিতে তুলে দিল। অর্ধেক শরীর জ্বলে যাওয়া তিনজন লোককেও মিলিটারীরা উদ্ধার করে আনল। তাদের শরীর বয়ে তখন চর্বি গলে গলে পড়ছে। মাংসগুলো ঝল্‌সে গিয়ে শরীর হাড় থেকে আলগা হয়ে পড়েছে, কনুই আর হাঁটুর কাছে হাড়ের পিঞ্জর স্পষ্ট দৃশ্যমান! বাসিন্দাদের বাকী সকলকে উদ্ধার করে লরিতে তুলতে তুলতেই সেই তিনজনের প্রাণপ্রদীপ নিভে গেল! তখন সেই তিনজনেরই লাশ মাটির ওপর নামিয়ে রেখে লরি ট্রাকগুলো রওনা হয়ে গেল। তাদের আত্মজনেরা বৃথাই চেঁচাতে লাগল, প্রাণফাটা কান্নায় মাথা কুটতে লাগল। কিন্তু মিলিটারীদের তখন লাশগুলিকে জ্বালানো পোড়ানোর মত সময় ছিল না।

পূরোদের গ্রাম খালি হয়ে গেছলো। অন্য জাতের আর একজনও কেউ সেই গ্রামে অবশিষ্ট রইলো না। কেবল তিনটে আধপোড়া লাশ সেই বড় বাড়ীটার সামনের মাটিতে পড়েছিল। যাদের হাঁড়ের খাঁচার সঙ্গে লাগা আধপোড়া মাংসগুলো দিনের মধ্যেই গাঁয়ের কুত্তাগুলো কাকের দল টেনে ছিঁড়ে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলেছিল।

পূরোর দুই চোখে যেন কেউ সীসের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়েছিল! একদিন পূরো দশ বার জন স্ফূর্তিবাজ নবযুবককে একটা উদোম উলঙ্গ যুবতী মেয়েকে সামনে রেখে দুহাতে ঢোল-ঢাক বাজাতে বাজাতে ওদের গাঁয়ের পাশ দিয়েই মিছিল করে যেতে দেখল! কে জানে তারা কোন্ গ্রাম থেকে এসেছে বা কোন্ গ্রামে যাবে।

পূরোর মনে হল এই বিশ্বসংসারে এখন নিছক বেঁচে থাকাই এক দুর্ভাগ্য হয়ে উঠেছে, সর্বোপরি এই যুগে মেয়ে হয়ে জন্মানোই যেন পাপ!

সেদিনই সন্ধ্যের সময় পূরো আখের ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা মেয়েকে দেখতে পেলো। শেষে রাতের ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সেই মেয়েটাকে ও নিজের ঘরে নিয়ে এল।

সেই মেয়েটা পূরোকে বলল যে পাশের গ্রামে একটা ক্যাম্প খোলা হয়েছে। সেখানে গ্রামের সব হিন্দুরা একত্র হয়ে মিলিটারী আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা এসে সবাইকে ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে অন্য পারে হিন্দুস্থানে নিয়ে যাবে। এদিককার ফৌজি জওয়ানরা এখন ক্যাম্পের ভালমন্দর দিকে নজর রাখছে। কিন্তু এরই মধ্যে প্রতিদিনই রাতের বেলা লুকিয়ে চুরিয়ে এসে ক্যাম্প থেকে যুবতী মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর পরদিনই বিধ্বস্ত, একটা কোনমতে জ্যান্ত দেহকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সেই মেয়েটা পূরোকে আরও বলল যে পর পর নয়দিন রাতে তাকে নতুন নতুন লোকেদের ঘরে যেতে হয়েছে। গত রাতে কোনক্রমে সে তাকে যে নিতে এসেছিল তার চোখে ধুলো দিয়ে

পালাতে পেরেছিল। তারপর দৌড়তে দৌড়তে সে এই গাঁয়ে এসে পৌঁছেছিল। যখন ভোরের আলো ফুটে উঠে ক্রমশঃ দিন হতে লাগল তখন সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কোনদিকে যাবে। ওই আখের ক্ষেতের মধ্যেই দিনের সমস্ত সময়টা সে কোনমতে লুকিয়ে বসেছিল।···

পূরোর মনের ভেতরটা এইসব শুনতে শুনতে কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। শুনতে পারছিল না আর ও। ও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না এইসব কথা। মেয়েটাকে ও ওদের পেছনদিককার একটা ঘরে সরিয়ে দিল। সেখানে ওদের গমের বস্তা, মোষের খাদ্য খোল-ভুষির বস্তা সব স্তূপাকারে রাখা ছিল।

দ্বিতীয় দিন দুজন লোক এল দৌড়তে দৌড়তে। তারা গ্রামের সকলকেই জিজ্ঞেস করেছে যে কেউ কোন একটা মেয়েকে দেখেছে কিনা? তারা গ্রামের সব বাড়ীর ভেতরের উঠোনেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু খোঁজ পায়নি মেয়েটার।

পূরোর মনে থেকে থেকেই কতগুলো প্রশ্ন জাগে, কিন্তু কোন উত্তরের কথাই ও ভেবে ঠিক করতে পারে না। ও বুঝতে পারছিল না এই পৃথিবীর যে মাটির বুক মানুষের রক্তে থই থই ভিজেছে, এরপর সেই মাটির বুকে আগের মত আবার গমের সোনাবরণ শিষ উৎপন্ন হবে কি না···এই পৃথিবীর ক্ষেতের মাটিতে পড়ে মানুষের মৃতদেহ যখন পচে যাচ্ছে, তখন সেই ক্ষেতে উৎপন্ন মকাই ভূট্টা থেকে আগের মত সুগন্ধ আর বাতাসে বইবে কিনা···এইসব স্ত্রীরা আর এই সমস্ত পুরুষদের জন্য সন্তানের জন্ম কি দেবে যে পুরুষেরা ওই সব স্ত্রীদের আপন ভগ্নীদের ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার করেছে?···

হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া একদল মানুষ পূরোদের গ্রামের কাছে এসে থামল। পুরুষ আর স্ত্রী, একদল মানুষ, সবাই পায়ে হেঁটেই চলেছে। মোষের গাড়ী, গরুর গাড়ীতে সমস্ত বাচ্চা-কাচ্চার দল। সিপাইদের একটা দল কিছু আগের দিকে কিছু পেছন দিক থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। যাত্রীদের চোখের

পাতা ভারী হয়ে গেছে। রাস্তার ধুলো বালি সাক্ষাৎ দুর্দৈবের মত তাদের মুখে মাথায় মাখামাখি হয়ে সেখানেই জমে গেছে।

পুরোদের গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নেমে পড়ায় এখানেই থামতে বাধ্য হয়েছে তারা।

পুরো ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ওর থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল যে রত্তোবাল গ্রামের সড়ক ধরেই এরা এসেছে! তাহলে এই দলে নিশ্চয়ই ওর রামচন্দ্রও থাকবে···এইবার শেষবারের মত সাক্ষাৎ···ব্যস্! মাত্র একবার···শেষবার···তারপর এই দেশেই আর সে থাকবে না···এরপর আর কখনও, কোনদিনও তার কুশল সংবাদ শুনতে পাবে না পুরো···এরপর আর কখনও তার গ্রামের বাতাস এইদিকে, পুরোর দিকে এসে বহে যাবে না।

দলের থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সন্তর্পনে নিয়ে আসা সামান্য গয়নাগাটি আর পয়সা-কড়ি দিয়ে রাস্তা চলতে আশপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে আনাজ-পাতি কিনে-টিনে কোনমতে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। গ্রামের কিছু কিছু স্ত্রী-পুরুষ তাদের কাছে এসে সওদা করতো আর পাহারাদার সিপাহীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে আনা মকাই বাজরা সোনার দরে সোনার বিনিময়ে বিক্রি করে যেতো। এই ছুতো করেই পুরো গিয়ে সেই দলটাকে দেখল···

পুরো দলের মধ্যে বসে থাকা রামচন্দ্রকে দেখল। রামচন্দ্রও রত্তোবালের ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়ানো অশ্রুসিক্ত পুরোকে চিনতে পারলো।

রত্তোবালের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে পুরোর মুখ সাহসের অভাবেই হয়তো বন্ধ হয়ে ছিল, আর আজ ওর মুখ বন্ধ পাশেই দাঁড়ানো সিপাহীদের জন্য। কিছুই বলতে পারল না পুরো।

'তোমার কি আনাজ-দানা কিছু লাগবে?' ও রামচন্দ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল।

'হ্যাঁ,' রামচন্দ্রের দৃষ্টি পুরোর মুখের ওপর স্থির, বুঝি বা এখনও সে পুরোকে ভালভাবে চিনবার চেষ্টা করছিল।

'আচ্ছা, টাকা পয়সা ঠিক রেখো, আমি রাতের বেলা পৌঁছে দেবো।' পাশেই দাঁড়ানো সিপাহীর দিকে এক নজর তাকিয়ে ফের রামচন্দের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে পুরো ফিরে গেল।

পুরো রশীদকে বলল যে ঘরে লুকিয়ে রাখা মেয়েটাকে ওই হিন্দুদের দলের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে ওকে। বলে আটা আর মাটির ভাণ্ডে করে কিছু পরিমান ঘি নিয়ে ভাল করে কাপড় দিয়ে বেঁধে মেয়েটাকে সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে নিদ্রিত মানুষের দলটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

দিনের পর দিন হাঁটতে হাঁটতে সকলেই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। সব সময় একটা ভয় চামচিকে বাদুরের মত তাদের মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল, তবু খড়কুটো পেতে তার ওপরই শুয়ে পড়েছিল তারা।

'আমি রাতের বেলা পৌঁছে দেবো।' বিকেল থেকেই রামচন্দের কানে পুরোর কথাগুলো গুঞ্জন তুলছিল। রামচন্দ রাতের নিস্তব্ধতাতে তাই কারও পায়ের শব্দ শোনবার জন্য জেগে বসেছিল।

সিপাহীরা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। পুরো পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রিত দলের কাছে চলে এল।

মাথা থেকে গাঠরীটা নামিয়ে রামচন্দের সামনে রাখল। তারপর সঙ্গের মেয়েটাকে বলতে বলল।

'তুমি তো পুরো, সত্যি সত্যি পুরো, তাই না?' আজও রামচন্দ সেই রত্তোবাল গ্রামের ক্ষেতে যে প্রশ্ন করেছিল তেমন ভাবেই জিজ্ঞেস করল।

'এখনও জিজ্ঞেস করা বাকী রইল?' পুরো যন্ত্রণা কাতর স্বরে বলল। জীবনে এই প্রথমবার এবং শেষ বার রামচন্দের সঙ্গে এমন স্বরে কথা বলল পুরো। রামচন্দ মাথা নীচু করে ফেলল।

'আমার মা-বাবার কোন খবর?' পুরো গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল।

'ওরা তো বিয়ের কাজ সেরে সেই যে গেল আর ফেরেই নি,...

কিন্তু···রামচন্দ্র বলতে বলতে থেমে গেল।

'বিয়ে? কার বিয়ে?' পূরো জিজ্ঞেস করল।

'তুমি নিখোঁজ হয়ে যাবার পর ওরা একদিন রাতে চুপিচুপি তোমার ছোট বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেয় আর তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়ে যায়। তারপর থেকে ওরা আর এই গাঁয়ে ফিরে আসে নি। আজকাল সিয়ামেই আছে। কিন্তু···' আবার বলতে গিয়েও থেমে গেল রামচন্দ্র।

'আমার বোন···তবে তো ও এখানে তোমাদের সঙ্গেই আছে?' পূরোর কাছে রামচন্দ্রের সঙ্গে ওর ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যাবার সংবাদ একেবারেই নতুন।

'না, কদিন আগে তোমার ভাই এসেছিল। সে তার বউকে এখানে বাপের বাড়ীতে রেখে নিজের বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে যদি এখানে থাকত তাহলে তাকেও'—রামচন্দ্রের দুচোখ ভরে জল ছলছল করে এলো।

'তাকেও—মানে—কার কি হয়েছে?—' পূরো কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'খোঁজ পাওয়া যায় নি, কোন সময় আমার বোনটাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। যখন আমরা ঘর ছেড়ে রওনা দিলাম আমাদের সঙ্গেই ছিল। আমি বুড়ি মা-কে পিঠে উঠিয়ে নিয়ে এই কাফেলাতে এসেছিলাম। তখন সে আমার পেছনেই আসছিল। কিন্তু এখন এই দলের মধ্যে সে নেই—' রামচন্দ্র জোর করে করে গলা দিয়ে স্বর বার করে করে কোনমতে থেমে থেমে কথাগুলো বলতে পারল। কান্না উঠে আসছিল তার বুকের ভেতর থেকে। মাথার পাগড়ীর কাপড়টা শেষে মুখের ওপর চেপে ধরল সে। 'মা নিজের বুকে, নিজের শরীরে চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে কালসিটে ফেলে দিয়েছে।' রামচন্দ্র কোনক্রমে এটুকুও বলতে পারল।

পূরোর অন্তরাত্মাটা কে যেন শক্ত করে ধরে মোচড়াতে লাগল।

করে দেখো, যদি কোনরকম খোঁজ পাও। কে জানে

বেঁচেই আছে না মরে গেছে।' রামচন্দ আবার বলল। বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় কুঁকরে কুঁকরে উঠছে, পূরো কোন কথাই বলতে পারল না।

'তার নাম বোধহয় ছিল লাজো?' পূরোর মনে পড়ল। নিজের বিয়ের পাকা দেখার সময় ও নিজের ভাইয়ের বাগদত্তা বধূর নামটা শুনেছিল।

'হ্যাঁ, তার হাতে নামটা উল্কি করে লেখা আছে।' রামচন্দ বলল। সিপাহীরা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। শুয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে বসে রামচন্দ আর পূরো ধীরে ধীরে কথা বলছিল।

'এই বেচারী মেয়েটাকে আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। একে তোমাদের দলের সঙ্গে নিয়ে যাও। হিন্দুস্তান গিয়ে একটু খোঁজখবর করে দেখো যদি এর মা বাবার খোঁজ পাওয়া যায় তো—' পূরো মেয়েটার একটা হাত নিয়ে রামচন্দের হাতের মধ্যে দিয়ে দিল।

'আমার ভাইটা এখানে এসেছিল, ইচ্ছে ছিল যদি একবার দেখা হতো তার সঙ্গে—' পূরো মনের কথাটা বলে ফেলল।

'কদিন আগে—যেদিন তোমাদের ছত্তোয়ানীর ক্ষেতে আগুন লেগেছিল, মনে পড়ে—' রামচন্দ বলছিল।

'আগুন?—হ্যাঁ, আগুন লেগেছিল। তাহলে একথা কি সত্যি যে আমার ভাইই সেই আগুন লাগিয়েছিল? পূরোর সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল যেদিন রশীদ এইরকম একটা সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছিল।

'হ্যাঁ, সে-ই আগুন লাগিয়েছিল। তোমার ঠিকানা মানে তুমি কোথায় থাকো সে তো তোমার ভাই জানতো না। তাই রাগের বশে সে রশীদের ক্ষেতের ফসলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।'

পূরোর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হলো। ওর ভাই এখন বড় হয়েছে, জোয়ান হয়ে উঠেছে, তার বুকে এখন প্রতিশোধের জ্বালা ধিকি ধিকি জ্বলছে, তার মনে ছিল এবং আছে তার বোনের কথা, দিদির কথা। সঙ্গে সঙ্গে ওর এক্ষুনি মনে পড়ল সেই দুর্ঘটনার কথা, একটু

আগেই রামচন্দের মুখে শোনা সেই দুর্ঘটনা, ওর ভাইয়ের স্ত্রীও গুম্ হয়ে গেছে, কেউ তাকেও জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেছে, না জানে সে কেমন অবস্থায় ছিল, সে—ওর রামচন্দেরই বোন—

'আমাকে এখানে সক্কড়আলী গ্রামের ঠিকানায় চিঠি দিও, নিজের ঠিকানাও দিও, যদি লাজোর কোন খোঁজ পাই তো আমি চিঠি লিখে জানাবো—' পূরো কোনমতে বলল।

রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসছিল। সিপাহারা দলের লোকেদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছিল। সবাইকে আবার এগিয়ে যেতে হবে। পূরো উঠে দাঁড়ালো।

হাত জোড় করে রামচন্দকে নমস্কার করল পূরো। কিছুই বলতে পারলো না মুখে।

দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে কেবল বাইরে পা রেখেছে কি না রেখেছে পূরো অমনি একজন সিপাই ওর মাথা লক্ষ্য করে লাঠি ওঠালো, 'এই, তুই কে? কোথায় চলে যাচ্ছিস?'

'আমি আনাজপাতি বেচতে এসেছিলাম।'

'কত দামে বেচেছিস? পয়সা দেখা।' সিপাই চিৎকার করে বলল।

পূরো গায়ের চাদরের ভেতর থেকে নিজেরই হাতের একটা রূপোর রুলি খুলে নিয়ে সিপাইকে দেখিয়েই তাড়াতাড়ি দ্রুত পায়ে গায়ের দিকে ফিরে চলল।

সিপাইটা বোধহয় এটুকু আর ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না যে হিন্দু ঘরের মেয়েরা রূপোর আভূষণ ক্বচিৎ কদাচিৎই পরে। তাহলে আনাজের বদলে এই মেয়েটার কাছে রূপোর রুলিটা এলো কোত্থেকে!

পূরোর বৌদি

রাতে চারপাইয়ের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে থেকে পূরো কেবল ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে মাকড়সাগুলোর জাল বোনা দেখে। আর মনটা ওর ঘুরে বেড়ায় সেই লোকগুলোর বন্ধ কুঠরীগুলির মধ্যে যাদের ভেতর লোকেরা অন্য লোকেদের মেয়ে, বোন আর স্ত্রীদের জবরদস্তি ধরে এনে আটকে রেখেছে। তাদের মধ্যেই কেউ একজন লাজো। লাজো, রামচন্দের বোন, আর ওর নিজের বৌদি! লাজোর অদেখা মুখ ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে, খসে পড়া পালকের মত যার চেহারা!

পূরো ভাবতে থাকে, লাজোর বিয়ে হয়েছে, হয়তো বাচ্চাটাচ্চাও আছে। আহ্। বেচারীর মনের ওপর দিয়ে কি ভীষণ ঝড় না বহে গেছে, আর শরীরটার ওপর দিয়ে যে কি ভয়ানক ঘূর্ণিপ্রবাহ বয়ে গেছে, ভাবতেও শিউরে ওঠে ও। না জানি এখন কোথায় আছে মেয়েটা! আমি তাকে কি করে খুঁজবো? আমি তাকে চিনবোই বা কি করে? সেই দিন আখের ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা মেয়েটাই যদি লাজো হতো, আমি তাকে সেই কাফেলার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতাম···আমি তাকে রামচন্দের কাছেই সঁপে দিয়ে আসতাম·· পূরো সব কথা রশীদকে বলল আর বলে তার পায়ের ওপর পড়ল।

'যে ভাবেই হোক আমাকে দয়া করো! আমি এই এতগুলো বছর তোমার কাছে কিছুই চাইনি। আমাকে লাজোর খোঁজ এনে দাও, যে ভাবে পারো···' পূরোর চোখের জল বাধা মানছিল না। রশীদ প্রতিজ্ঞা করল যে নিজের দিক থেকে সে কোন রকম ত্রুটি রাখবে না।

রশীদ অনেক চিন্তা ভাবনা করে শেষে সিদ্ধান্তে পৌছল যে সেই রত্তোবাল গ্রামেই লাজোর থেকে যাবার সম্ভাবনা বেশী। মেয়েটা

ঘর থেকে দাদা ভাইয়ের সঙ্গে বেরুলো, অথচ দলের সঙ্গে এল না। দলটা যখন যাচ্ছে, তখন মাঝপথেই নিশ্চয়ই কারো হাতে পড়ে যায় বেচারী মেয়েটা।

দুবার চক্কর দিল রশীদ রত্তোবাল গ্রামে। কিন্তু লোকেদের বাড়ীর মধ্যে সে আর কি ভাবে উঁকি ঝুঁকি দেবে। যত দোকানপাট ছিল সব কটা থেকেই কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনল, কিন্তু লাজোর কোন রকম হাল হদিস করতে পারলো না সে। অবশ্য নিশ্চিত করে এইরকম একটা খবর সে পেলো যে গ্রামের কিছু ছেলে সেই কাফেলার দল থেকে দু'চারটে মেয়েকে অবশ্যই তুলে নিয়েছে। রশীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে লাজো নামে মেয়েটা তাদেরই একজন হবেই।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে রশীদের কোনরকম আলাপ পরিচয় তো ছিল না, বা তার কোন আত্ম-স্বজন পরিচিতি কেউও এই রত্তোবালে নেই। দু'চার দিনই বা সে কার কাছে থাকবে, কার কাছ থেকে গাঁয়ের হালচাল জানবে! এই অসুবিধার জন্যই রশীদ খুব একটা কিছু কবে উঠতে পারল না।

পূরো তখন রশীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উপায় বের করল। সেই কুয়োপাড়ের বাবলী সাঁই তো আছে। একবার গিয়েছিল। চেনা জায়গা। পূরো বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সাঁইয়ের একটা কুঠুরীতে এসে বসল। এমনিতেও দিনরাত চিন্তা করার ফলে পূরোর চোখ দুটো ইদানীং বেশ ফোলা ফোলাই লাগত। পূরো রোজ সকালে উঠে নমাজ পড়ে বাবলীব (কূয়ো) জল দিয়ে নিজের চোখ দুটো ধুয়ে নিত, সাঁইয়ের পুজোর জন্য মিঠাইয়ের ডালা ঘরে দিত। তারপর দিনের বেলা কোরা খেস্-এর গাঠরী মাথায় নিয়ে গ্রামের মধ্যে বেচতে চলে যেতো।

সেই সময় গ্রামের পুরুষরা চলে যেতো মাঠে। আর গ্রামের বাড়ী বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা ঘরের নানান গৃহস্থালীর কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। পূরো প্রত্যেক ঘরে গিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করত।

খেসের দাম পুরো এত বেশী বাড়িয়ে বলত যে শেষ পর্যন্ত কোন গিন্নীই ওর কাছ থেকে কিনতে রাজী হতো না। তাছাড়া, গাঁয়ের সবার বাড়ীতেই দড়িকাটা বা খেস বানিয়ে নেবার প্রচলন তো ছিলই উপরন্তু লুটমার করেও তো ইদানীং সকলেই বেশ কিছু খেস টেস আরও কত কি পেয়ে গেছে বিনা কষ্টে বিনা পয়সায়। ফলে পুরোর কাছ থেকে কিনবার দরকার ছিল না কারোর। কিন্তু পুরো ঠিক জেদ করে নাছোড়বান্দার মত গিয়ে সবার ঘরে উঠোনে বসত, ভেতরে বাইরে সতর্কভাবে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতো, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে বলে অন্তরঙ্গ করে ফেলত. সাম্প্রতিক গাঁয়ে লুটপাট হয়েছে, তাতে কার দখলে কার কত রকমের জিনিস এসেছে, এইসব নিয়ে হেসে হেসে কথা বলত।'

হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া বাড়ীগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতো তারপর। পুরো তো আর রামচন্দের বাড়ীটা চিনতো না, কিন্তু গ্রামের লোকেদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতেই ও রামচন্দদের বাড়ীটার হদিস পেয়ে গেল। রশীদ এবং পুরো, দুজনেরই মনে হয়েছিল যে লোক লাজো নামে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে, হয়তো সেই লোকটাই লাজোদের বাড়ীরও মালিক হয়ে বসেছে। তা সেই বাড়ীর আশেপাশে দু'চার বার চক্কর দিল পুরো। কিন্তু প্রত্যেকবারই একটা বুড়ি ওকে বাড়ীর দরজা থেকেই বিদায় করে দিল। বলতো যে আমাদের কিছু কেনাকাটা করবার নেই।

যেমন জবরদস্তিতে কেউ কারো ঘরে ঢুকে যায়, তেমনিভাবেই একদিন পুরো সেই বাড়ীর একেবারে ভেতরের উঠোনে গিয়ে হাজির হলো।

'আম্মা, না হয় তুমি কিছু কিনো না, কিন্তু একবার জিনিসগুলো দেখ অন্তত। দেখবার জন্যে তো আর তোমার কাছে দাম চাইব না।' বলেই পুরো খেস-এর গাঠরীটা খুলে খেসগুলো সব ছড়িয়ে বিছিয়ে দিল। তখন উঠোনে ওই বুড়ীটা ছাড়া আর কেউ-ই ছিল না।

'আল্লা মঙ্গল করুন তোমার। আমাকে একটু জল খাওয়াও আম্মা। সকাল থেকেই বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। খাব খাব করেও খাওয়া হয়নি।' বেশ সাহস করেই কথাগুলো বলল পুরো।

'আরে জল কেন, তুই লস্যি খাবি। কিন্তু তোকে বলছি যদি তুই এই সব খেস আর চাদর বেচতে চাস তো শহরে যা। সেখানে লোকে সুতোও কাটে না, কাপড়ও বোনে না। গাঁয়ে কোন ঘরে কি খেসের কমতি আছে!' বুড়ি পুরোকে পরামর্শ দিল, তারপর ভেতরের ঘরের দিকে মুখ করে ঈষৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওরে ভাল মানুষের বেটি, এক কটোরা লস্যি ভরে নিয়ে আয় তো।'

পুরোর বুকের মধ্যে ধুকপুক করতে লাগল। ভেতর থেকে আসা মেয়েটার চেহারা সত্যি সত্যি খসে পড়া পাতার মত, ভেঙ্গে যাওয়া পাখীর ডানার মত নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ। পুরোর মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। হলেও তো হ'তে পারে যে এই মেয়েটাই লাজো!

যতদিন পুরো কোন বিশেষ জায়গায় লাজোর খোঁজ পাবে বলে ভাবে নি, ততদিন ওর ভাবনাটা ছিল যে যদি কোন ভাবে কোন জায়গায় তার দেখা পেয়ে যায়। কিন্তু এখন ওর সন্দেহ দৃঢ় হল যে লাজো তাদের নিজের বাড়ীতেই বন্দিনী হয়ে আছে। কিন্তু সন্দেহ হলেও তার নিরসন করবে কি করে সেটাই ভেবে পেল না পুরো।

'এইটি তোমার মেয়ে বুঝি?' পুরো গলার স্বরে খুব মিষ্টতা ঢেলে জিজ্ঞেস করল। তারপর মেয়েটার হাত থেকে লস্যির কটোরাটা নিল।

'হ্যাঁ, ওই···সেইরকমই···' বুড়ি যেন প্রশ্নটাকে কোন মতে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল।

'একটু নুন দিও তো, লস্যিতে মিশিয়ে নেবো', পুরো এক ঢোঁক খেয়ে কটোরাটা হাতেই ধরে রাখল।

মেয়েটা চুপচাপ নুন এনে পুরোর সামনে ধরে দিল। তার হাত থেকে নুন নেবার সময় পুরো তার একটা আঙ্গুলে ঈষৎ চাপ দিল।

নবযুবতী সামান্য চমকে উঠে পূরোর দিকে দেখল, কিন্তু তার মুখ-ভাবে না এল কোন হাসির চিহ্ন বা কোন কথাও মুখ দিয়ে বেরুলো না। মেয়েটাকে কেটে ফেলা আখের ডগার মত মনে হচ্ছিল দেখে।

পূরোর তাতে আরো বেশী বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো যে এই মেয়েটা হয়তো সত্যিই লাজো না হলেও কোন ভাগিয়ে আনা মেয়ে অবশ্যই হবে। বাড়ীটা সম্বন্ধে তো পূরো জেনেই গেছলো যে এই বাড়ীটা রামচন্দ্রদেরই। এবং তাতেই ওর মনে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় মূল হচ্ছিল যে এই মেয়েটিই লাজো।

লস্যি খেয়ে ভাণ্ডটা মাটির ওপর রেখে পূরো ওই যুবতীর হাত ধরল।

'এদিকে আয় মেয়ে, তোর নাড়ীটা দেখে দিই আমি। তোর দেহের বর্ণ হলদে হলদে দেখাচ্ছে।' বলতে বলতেই পূরো মেয়েটির একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে কুরতার হাতা (ফুলহাতা জামা) ওপর দিকে সরিয়ে দিল। নবযুবতীর বাহুর ওপর উল্কি দিয়ে তার নাম হিন্দিতে লেখা আছে, 'লাজো!' তবু ও মুখে কিছুই বলল টলল না। ওর দুটি ঠোঁটের ফাঁকে যেন পৌষ-মাঘ মাসের মত ঘন কুয়াশা জমে গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

'একটা কবচ টবচ বেঁধে দাও না, বাছা। মেয়েটার এই ঘরে মন বসুক। আমার ছেলের সঙ্গেও তো কথাবার্তা বলে না, বলতেও চায় না।' উদাস মুখ করে বুড়ি কথাগুলো বলল।

পূরোর পক্ষে নিজেকে সামলে রাখাই কঠিন হয়ে উঠছিল, তবুও তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, 'আমার কাছে এমন সিদ্ধ কবচ আছে যে বেঁধে দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই একেবারে মকাইদানার মত খিলখিলিয়ে হেসে উঠবে।'

'তুমি মেয়ে যা চাইবে তাই দেবো, আমাকে সেই কবচটি এনে দাও!' বুড়ি একেবারে পূরোর গায়ের দোপাট্টা টেনে ধরল।

'আরে, এটা আর এমন কি বড় কথা, আমি কালকেই নিয়ে আসব। আল্লাহ্ যদি চান তো···বলতে বলতে পূরো খেসের

গাঠরীটা বেঁধে নিল। যুবতী মেয়েটা তখনও বোবা-কালা মেয়ের মত পূরোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল।

খেস-এর গাঠরীটাব ভারে আজ যেন পূরোর কোমরটাই ভেঙ্গে যেতে চাইছিল। খুব কষ্টে পূরো কোন মতে কুয়োপারের কুঠুরীতে এসে পৌছল।

'এরপর, তুমিই ভেবে নাও, তুমি কিভাবে কাজটা করবে।' পূরো রশীদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত দিয়ে তারপর বলল কথাগুলো।

'কোনরকম একটা ছল ছুতো যদি...' রশীদ ভাবতে লাগল।

'আমাকে যেমন ঘোড়ায় তুলে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলে, তেমনই এখন সেইরকম সাহসের পরিচয় দাও ' পূরো রশীদকে একটু ঠেস দিয়ে কথাকটা বলেই হেসে ফেলল।

তারপর ওরা দুজনে মিলেই যুক্তি পরামর্শ করল। কিন্তু কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না। রশীদ বলছিল যে মেয়েটাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া তো কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তাকে এরপর পার করে দেবে কিভাবে?

পূরোর মনে হঠাৎ একটা চিন্তা জাগল যা আগে ভেবে উঠতে পারেনি। ভাবে নি। আমার মা-বাবা তো তাদের নিজের মেয়ে —আমাকেই ফিরিয়ে নিতে চায়নি, এখন এই মেয়েটা যে তাদেব পুত্রবধূ, কি স্বীকার করে নেবে? তারা যদি ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে করে বসে, তখন কি হবে?—

রশীদ তখন পূরোকে বলল যে এখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করেছে যে জবরদস্তি করে যে সব মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের খোঁজ খবর করে বার করে ফিরিয়ে দাও; কেননা তাদের বদলে ওপারে যারা রয়েছে তাদেরও ওখানকার সরকারের তরফ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এবং মেয়েদের মা-বাবা আত্ম-স্বজনেরাও সকলকেই ফিরিয়ে নেবে।

পূরোর বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা হঠাৎ পাক দিয়ে উঠল। শুর বেলা সব ধর্মের রাস্তায় কাঁটা বিছোনো ছিল, ওর মা-বাবা ওকে

স্বীকার করে নিতে চায় নি, ওর শ্বশুর বাড়ীর কেউও ওকে স্বীকার করে নি। আর আজ তো উভয় ধর্মেরই বাঁধন গেছে টুটে, আজ তাই···

নিজের বিষয়ে চিন্তা করা ছেড়েই দিল ও। এখন লাজো মেয়েটার কথাই ভাবতে লাগল।

সেই রাত পুরো আকাশের তারা গুনে গুনেই কাটিয়ে দিল। সকাল হতেই একটা চিন্তা ওর মাথায় কেবলই ঘুরপাক খেতে লাগল যে লাজোর বাড়ীর বুড়িটা কেমন, কোন সময় নিজের ছেলের জন্য রুটি তরকারী নিয়ে ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ও ফের দুচারটে কোরা খেস্-এর গাঠরী করে এক টুকরো কাপড়ে এক মুঠো ছাই বেঁধে নিয়ে রওনা দিল।

লাজোদের বাড়ীর ভেজানো সদর দরজা হাত দিয়ে ঠেলে খোলবার সময় পূরোর যত পীর ফকিরের কথা মনে পড়ল—তাদের নাম স্মরণ করল। প্রায় ভুলে যাওয়া দেব-দেবীর কথাও সশ্রদ্ধায় স্মরণ করল। একসময় পূরো বলত যে ভগবান ওর সৎপিতা আর খোদার ও সৎ মেয়ে, কোন ভগবান বা খোদাই ওর মনের দুঃখ বেদনাকে বুঝতে পারে নি। কিন্তু আজ পূরোর হৃদয়ে কেমন একটা ভয় জেগে উঠল। ও নিরুপায় ভঙ্গীতে ভগবান-খোদা-রহীমের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাল যে আজ যেন য ভাবেই হোক লাজোর সঙ্গে ওর একলা সাক্ষাৎ হয়!···

পূরো যখন লাজোদের বাড়ী পৌঁছেছে তখন দুপুরবেলা। বুড়িটা ছেলের কাছে ক্ষেতে দুপুরের খাবার দিতে চলে গেছে। লাজো একাকীই বিছানাহীন শূন্য খাটে শুয়ে পড়েছিল।

'আম্মা কোথায়?' উঠোনে পা রেখেই পূরো প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

'ক্ষেতে গেছে।' লাজো গতকালের খেস্-বেচনেওয়ালীর দিকে এক পলক তাকিয়ে উত্তর দিল। তার মনে এই খেস বেচনেওয়ালীর প্রতি একটা যে নতুন আকর্ষণ হয়েছে তা তার মুখের ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। লাজো উঠে খাটের ওপরেই বসল। বসে উৎসুক চোখে

তাকালো।

সেই ক্ষণেই লাজোর মুখাকৃতিতে পূরো যেন নিজের মা, নিজের বোন আর নিজের বৌদির মুখই দেখতে পেলো। ও এগিয়ে গিয়ে লাজোকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

পূরোর মনে হল ও এবার কেঁদে ফেলবে, এতজোরে চিৎকার করে কাঁদবে যে ওর সেই কান্নার শব্দ দরজা টরজা সব ভেঙ্গে ফেলবে, ওর কান্নার আওয়াজ ক্ষেতখামার পার হয়ে যাবে, ওর কান্নার তরঙ্গ গাঁ গঞ্জ ভেদ করে চলে যাবে, ওর কান্নার ঢেউ শহরগুলিকেও অতিক্রম করে যাবে, ওর কান্না—

পূরো ওর কান্নার আওয়াজ বাইরে বেরুতে দিল না।

'লাজো—আমার প্রাণের বৌদিদিমনি—' পূরো হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসা তুফানকে দাবিয়ে রেখে কোন মতে বলল।

'তাহলে তুমি পূরো?' লাজো পূরোর বাঁধন থেকে নিজেকে ঈষৎ সরিয়ে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু লাজো তো আগে কখনও পূরোকে দেখেনি যে এখন চিনতে পারবে, তবুও লাজোর এবার মনে হল যে পূরোর মুখের সঙ্গে ওর ভাই, তার স্বামীর মুখের মিল আছে। হঠাৎই লাজোর বুকের মধ্যে থেকে সেই লজ্জাশীলা রমনীটি বেরিয়ে এল, লজ্জায় যেন সে নিজের স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারছে না—লাজো পূরোর কোলে মুখ গুঁজে ঢলে পড়ল।

লাজোর অন্তরের অন্তস্থলে সেইসময় যে ভাব তরঙ্গ উঠেছিল তা বোধহয় পূরোরও শিরায় শিরায় ঢেউ তুলছিল। পূরোর তখন আর জিজ্ঞাসা করবার কিছুই ছিল না। ও লাজোকে নিজের বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রইল।

'কেউ এসে পড়বে, লাজো! আমার কথা শোন এখন!' সময় বয়ে যাচ্ছে এবার ওর চেতনাতে এল। লাজোর ফুঁপিয়ে কান্না থামছিল না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে চাইছিল না।

'বাড়ীর লোক কখন ফিরে আসে?' পূরো জিজ্ঞেস করল।

'আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল।' লাজো উঠতে চাইছিল না, কেবলই পূরোর কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চাইছিল।

'তোকে নিয়ে যেতেই তো এসেছি, তা নইলে এখানে আসব কেন! আমার কথা শোন। ওঠ।' পূরো লাজোর কাঁধ ধরে ওঠালো।

'হায়! আমাকে নিয়ে চল।'

'আরে, এখন সামলে সুমলে বোস্! কেউ এসে পড়বে—'

'আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল! আমি সারা জীবন তোমার বাঁদী হয়ে থাকব। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।'

'পাগলের মত করিস না! এভাবে তোকে নিয়ে আমি কোথায় পালিয়ে যাব? শোন্, আমার কথাগুলো তো শোন!'

'হায়! আমি কোথায় যাব! আমি এখানেই ছটফট করে মরব, মরে যাব।' লাজো কেঁদেই যাচ্ছিল। পূরো এবার ভয় পেতে লাগল। দরকারী কথাগুলো আর বুঝি বলা হবে না। বুড়িটা এসে পড়বে এক্ষুনি। পূরো ওর দোপাট্টার আঁচল দিয়ে লাজোর মুখ মুছিয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করল তাকে।

'কখনও না কখনও তো ঘর থেকে বাইরে বেরোতে হয়?'

'না।'

'ভোরে ক্ষেতে তো নিশ্চয়ই যেতে হয়!'

'সে সঙ্গে থাকে!'

'আজ সৌভাগ্যবশতঃ অমাবস্যা। আজ রাতে যদি তুই বাইরে, দূরে যে কূয়োটা আছে, যদি সেখানে আসতে পারিস, ওখানে রশীদ ঘোড়া নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবে।'

লাজো যেন ঝপ করে নিভে গেল। রাতে, একা কূয়ার কাছে পৌঁছন তার কাছে খুব কঠিন বলে মনে হলো। তা ছাড়া, রশীদকেও তো সে চেনে না। আর যদি কেউ দেখে ফেলে তো কারও জানই আর আস্ত থাকবে না।

'আমি ঘর থেকে বাইরে বেরুবো কি করে?'

'রাতে সবাই যখন শুয়ে পড়বে তখন চুপি চুপি খিল খুলে বাইরে চলে আসবি।'

'সে তো মদ খায়। তাকে না হয় যে ভাবেই হোক কিছুটা বেশী মদ গিলিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বাইরের উঠোনে যে বুড়িটা—'

'বুড়িটা আফিম টাকিম কিছু খায় না?'

'আমি তো খেতে দেখি নি।'

'একবার যদি সেখানে কোন ক্রমে পৌঁছে যেতে পারিস—'

'কিন্তু ওখানে—আমি তো তাকে চিনি না জানি না। যদি ওখানে তুমি থাক তাহলে '

'সে তো রাতে রাতেই গ্রাম পার হয়ে চলে যাবে, সেখানে আমি থাকলে তো দুজনকেই আটকে যেতে হবে।'

'আমি যে তাকে কখনও দেখিই নি।'

'তুই আমার ওপর ভরসা রাখ। তোর যাতে বিশ্বাস হয় সেটা করে দিচ্ছি। এই দেখ, আমার হাতের এই আংটিটা দেখ। এটা তার আঙ্গুলে পরা থাকবে। তুই দেখে নিবি।'

'আজ রাতে যদি সুযোগই না পাই, তাহলে?'

'তাহলে কাল রাতে। রশীদ তিন রাত্রি পর পর তোর জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'গলিতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় কেউ আসছে।'

পুরো খাট থেকে নেমে নীচে বসল। খাটের একটা কোণে খেসের গাঠরী রেখে পূরো ন্যাকড়াতে বাঁধা ছাইয়ের পুরিয়াটা বার করল, যদি বুড়ি এসেই পড়ে তাহলে সেটা বুড়ির হাতে দিয়ে দেবে।

কিন্তু বুড়িটা আসেনি তখনও।

'তুমি এই ওষুধ দেবার ছল করে রোজ যদি আমাকে কোন কূয়ার পারে নিয়ে যেতে থাকো তো সেখান থেকেই একদিন—।'

লাজো খুব স্তিমিত স্বরে বলে উঠল। যেন নিশ্চিত হতে পারছে না।

'তাহলে আমার ওপর গিয়ে সমস্ত সন্দেহটা পড়বে। আমার

ইচ্ছে যে রশীদ তোকে নিয়ে চলে যাবার পরও তিন চারদিন এই গ্রামে থেকে তারপর আমি যাব। আমার দিকে কেউ যেন সন্দেহের আঙ্গুলও না তুলতে পারে।'

'আমার ভয় হচ্ছে যে কেউ না আবার রাস্তার মধ্যেই আমাদের ধরে ফেলে।'

'তা ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। পরের কাজটাই যে উতরে যাবে সেও তো কেউই নিশ্চিত করে বলে দিতে পারে না।'

'কিন্তু আমি শেষে সারাটা জীবন তোমার বোঝার মত হয়ে থাকব!'

'ও সব কথা পরে ভাবলেও চলবে। এখন সে সময় নয়। আমার যা বলার ছিল বললাম। সেই মতই করবি। আমি এখন চললাম। আজ বুড়িটা যদি আমাকে না দেখে তো—'

'হায়! আমাকেও নিয়ে চল!' পূরো উঠতে যাবে কি বাচ্চাদের মত লাজো ওকে জড়িয়ে ধরল। পূরো একবার সদরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে লাজোকে শক্ত করে বুকের সঙ্গে বাঁধল দু'হাতে. তারপর বলল, আজ রাতে—মধ্যরাতে—কালকের ভরসায় থাকিস না।' বলেই লাজোকে ছেড়ে দিয়ে গাঠরীটা তুলে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন খাটের ওপর লাজো ফের দুপা ছড়িয়ে, হাত, শরীর শিথিল করে মরার মত পড়ে রইল। কিন্তু না। মরার মত নয়। বরং আজ ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গে একটা প্রফুল্লতার জোয়ার খেলা করে যেতে লাগল। সে যেন শুনতে পেল যে তাদের এই বাড়ীর প্রতিটি দেয়াল তাকে ডেকে ডেকে বলছে, 'আজ রাতে—আজ মধ্য রাতে…।' লাজো তাকিয়ে তাকিয়ে দালানের প্রত্যেকটা ইঁটকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। 'এখানেই আমার ঘর, এই বাড়ীতেই আমার জন্ম হয়েছে, এই বাড়ীতেই আমি বড় হয়েছি, পালিত হয়েছি; এই বাড়ী থেকেই আমার বিবাহের ডুলি (পাল্কী) উঠেছে আমি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী গেছি, আবার আমি এই বাপের

বাড়ীতেই ফিরে এসেছি ; এখন সব্বাই এই বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে ; কেবল আমার মরা দেহটা এই বাড়ীর চারদেয়ালের মধ্যে মাথা কুটে কুটে মরছে। আমি আমার নিজের বাড়ীতেই পরদেশী হয়ে গেছি। এই বাড়ীটাই আমাকে জন্ম দিয়েছে, এই বাড়ীটাই আমাকে গিলে ফেলেছে, একেবারে খেয়ে ফেলেছে।' লাজো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেই লাগল চারদিকের দেয়াল, দরজা, জানলা। 'এই দেয়াল-গুলোরও এতটুকু লজ্জা করল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সর্বনাশ হ'তে দেখল, আমার মর্য্যাদা ধূলোয় লুটিয়ে পড়তে দেখল', কিন্তু আজ,...আজ রাতে...অর্ধরাত্রে...বা মধ্যরাত্রে...সবকটা দেয়াল ভেঙ্গে যাবে, সব দরজা, জানলা-চৌকাঠ গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে পড়বে মাটির বুকে...আমি...।'

এই বাড়ীর বুড়িটা সদরের ভেজানো দরজা ঠেলে খুলে উঠোনের মাঝখানে চলে এসেছিল।

'খুব সময়ে চলে গেছে পূরো।' লাজো মনে মনেই কথাকটা বলে উঠল।

'আজ ওই খেস-বেচনেওয়ালীর আসবার কথা ছিল, এখনও আসেনি সে!' বুড়ি উঠোনে এসে দাঁড়িয়েই প্রথম এই প্রশ্নটা লাজোর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাতের এঁটো বাসনগুলো মাটির ওপরেই রেখে লাজোর খাটেরই একধারে বসে পড়ল।

বেচনেওয়ালীর নামটা উচ্চারিত হতে শুনেই লাজোর মুখের ওপর দিয়ে একটা চকিত চমক খেলে গেল। সে মাথা নেড়ে বলল, 'না'। তারপর ভাবতে লাগল, 'পূরো কেমন করে জানতে পারল যে আমি এখানেই রয়ে গেছি। ও আমাকে কেন এখানে খুঁজতে এল? কোন্ গাঁয়ে থাকে ও? আমি তো ওকে কিছুই এসব জিজ্ঞেস করলাম না। অবশ্য জিজ্ঞেস করবার সময়ই বা ছিল কোথায়!—'আজ রাতে ...মধ্যরাত্তে...' এই ধ্বনিটা এখন কেবলই থেকে থেকে ওর কানের মধ্যে গুঞ্জন তুলে কানের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।

'ওরে মেয়ে, ওঠ! উনুনে দু'চারটে মুঠি (গোবরের গুল) দিয়ে একটা হাঁড়িতে দুমুঠো চাল বসিয়ে দে। আমার শরীর আর বয় না বাপু।' বলতে বলতে বুড়ি চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে দেহটা এলিয়ে দিল একেবারে।

যেমন শেষবারের মত কাজ করার সময় কেউ তাড়াতাড়ি সব কিছু করে মিটিয়ে ফেলতে চায়, সেইভাবে ভঙ্গীতেই লাজো উঠে পড়ে গোবরের মুঠি পাকানো গুল কতকগুলো নিয়ে প্রায় নিভন্ত উনুনের মধ্যে গুঁজে দিল, তারপর দু'চারটে লকড়িও গুঁজে দিল, চাল-ডাল বেছে নিয়ে খিচুড়ি বসিয়ে দিল উনুনের ওপর। আগে এতদিন ধরে আটা চালা, তারপর মাখা, সবই করত বুড়ি। কিন্তু আজ লাজোই আটা চেলে মাখতে বসে গেল।

আজকের দিনটা ছেঁড়া জুতোর মত কেবলই বাড়তেই লাগল যেন। অতিকষ্টে যেন চৌকাঠ পার হয়ে রাতের ঘরে ঢুকল দিন। আজ যখন বুড়ির ছেলে ঘরে ফিরল, তখন লাজোর মনের কঠোরতা ততটা আর দৃঢ় ছিল না। আগে আগে রোজই যখন লাজো তাকে দেখতো তো তার মনে হতো যেন মাথার মধ্যের ঘিলুতে সহস্র বৃশ্চিকের দংশনের বিষে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত শরীরটা।

হাঁড়ির মধ্যে হাতা দিয়ে মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে গিয়ে আজ তার হাত থেকে তিন তিনবার হাতাটা পড়ে গেল : রুটি বেলতে গিয়ে বেলুনটা হাত থেকে ছিটকে গেল দু'বার। দু'একবার তো তার হাত থেকে কাঁসার বাটি গেলাসও মেঝেতে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল যেন!

'হুঁশ রেখে কাজ কর।' দু'একবার বুড়িও দাঁত কিড়মিড় করে ধমকে উঠল।

'চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে নাকি!' বুড়ির ছেলেও তাকে টিপ্পনি কাটল।

কিন্তু আজ লাজোর কাছে বুড়ির একটা বুলিও কু-বুলি বলে মনে হলো না। আর বুড়ির ছেলের কথা সে যেন শুনেও শুনছিল না।

আজ তার যেন কেমন মনে হচ্ছিলো যে আজ ঘরের মালপত্তর-আসবাবগুলোও বুড়ি আর তার ছেলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ ভেঙচাচ্ছিল।

লাজোর মধ্যে আজ একটা অপূর্ব সাহসের সঞ্চার হচ্ছিল। ওর বুকের মধ্যেও ভয়টা তেমন আর দানা বাঁধতে পারছিল না বা তার মনেও সঠিক কোন চিন্তা ভাবনার উদয় হচ্ছিল না। ব্যস, কেবল একটা নির্দিষ্ট সময়, যেন কাছে, ক্রমশ আরও কাছে এগিয়ে আসছিল। এখন রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে নামবে, তারপর সকলে শুয়ে পড়বে, তারপর যেমন সাবান মাখানো হাত থেকে সহজেই পিছলে চুড়িগুলো বেরিয়ে আসে, সে-ও এই ঘর বাড়ি থেকে তেমনি পিছলে বেরিয়ে চলে যাবে।

এতদিন লাজো দাঁতে দাঁত চেপে বিষে জর্জরিত দেহে উঠে বুড়ির ছেলের সামনে ঠক করে মদের বোতলটা বসিয়ে দিত ; কিন্তু আজ সে নিজে, বেশ আগ্রহভরে ভেতর থেকে যে বোতলগুলোতে এলাচদানা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়ে ডবল আঁচে ফুটিয়ে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে বস্তা চাপা দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল পুরোনো হবার জন্যে, সেখান থেকে একটা বোতল বার করে নিয়ে এল।

বুড়ির ছেলে ভাবছিল যে আজ লাজো খিচুড়ি বানিয়েছে যেন ঠিক মালাইয়ের মত, এমনি স্বাদ ; আজ লাজো স্বয়ং মদের বোতল বার করে এনে দিল, আজ লাজোকে খুব খুশী খুশী লাগছে, আজ···।

বুড়ি বসে থেকে ঘুমের ঝোঁকে ঢ'লে ঢলে পড়ছিল।

'উঠোনে আজ ঠাণ্ডা লাগছে, আমি তোমার খাটটা ভেতরে এনে দিয়েছি, যাও, ঘরের ভেতর খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' লাজো ঠিক ঘরের গিন্নির মত কর্তৃত্বের স্বরে আদেশ করল যেন। একবার মাত্র বুড়ি চোখ দুটো বড় বড় করে লাজোর দিকে তাকালো।

'আজ তো দেখছি দিনটাই পাল্টে গেল হঠাৎ। মেয়েটার হাতে আজ মন্ত্রপড়া পীরের মাদুলি বেঁধে দেবো ভেবেছিলাম ; এতো দেখছি পীরের মাদুলির নামেই কাজ হয়ে গেছে।' মনে মনেই বুড়ি

কথাগুলো আওড়ালো, তারপর উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর পাতা খাটে শুয়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকার প্রতিটি পলে পলে আরও গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। বুড়ির ছেলে মদের ঘোরে বুঁদ হয়ে গিয়ে লাজোর হাত ধরে টানাটানি করে যাচ্ছিল।

রাতের প্রথম প্রহর কখন পার হয়ে গেছে। বুড়ির বেটা মদের নেশায় চুর হয়ে খাটের ওপর পড়ে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোচ্ছিল।

সেই ঘরের দেয়ালগুলো, সেই ঘরের কড়িকাঠ জানলাগুলো, যারা এই ঘরের মধ্যে কতরকমেরই না পরিবর্তন দেখেছে, আজ এখন এর মধ্যে রাতেও দেখতে লাগল যে এই ঘরেরই মেয়ে লাজো দরজার খিল খুলে, এই ঘরেরই চৌকাঠ পার হয়ে চিরদিনের মত বাইরে চলে গেল।

লাজো একটু দূরে যায়, আর ভয় করতে থাকে তার, কেউ বুঝি তার পিছু ধেয়ে আসছে, এই এল বলে, এসেই কেউ ওর কাঁধ দুটো শক্ত করে চেপে ধরল, তারপর গলাটাতে হাতের শক্ত প্যাঁচ দিয়ে আঁকড়ে ধরে পিছন দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। শীতের এই মধ্যরাতের তীব্র ঠাণ্ডাতেও লাজোর কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটাগুলো তার মুখ গলা ভিজিয়ে দিতে লাগল।

রাতটা যদিও অমাবস্যারই ছিল, তবু কালো আকাশের গায়ে অসংখ্য ঝিকিমিকি তারার আলো দেখে আশঙ্কা জাগছিল লাজোর মনে যে এত আলোয় এবার সত্যিই কেউ ওকে দেখে ফেলবে। নিজের ঘরের সীমানা পার হয়ে এবার যখন সে পাড়ার অন্যান্য বাড়ীর মাঝের পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে তখন প্রতি পদে পদেই তাকে থমকে থমকে দাঁড়িয়ে চার পাশ দেখে নিতে হচ্ছে। একবার লাজো ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে নিজের বাড়ির শেষ সীমানার পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে দেখল। কুয়াশার মত নিস্তব্ধতা সমস্ত পাড়াটার বুকে ঘন হয়ে জমাট বেঁধে আছে। তবুও লাজো গলির সোজা রাস্তায় না গিয়ে ঘর বাড়ির পিছনের লম্বা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল দ্রুত

পায়ে।

ঘরবাড়ির সীমা পার হয়ে এল সে। সেই কূয়ার পাড়ে যেতে হলে একটা বেশ লম্বা চওড়া ময়দান পার হতে হবে। ভাবতেই লাজোর খালি পা দুটো থেকে একটা কাঁপুনি উঠে একেবারে তার মাথার শিরায় শিরায় দপদপ করে বাজতে লাগল। লাজো একবার পিছন ফিরে কবরের সারির মত নিঃশব্দে পড়ে থাকা বাড়িগুলোর দিকে দেখল। এখনও কোন প্রলয় ঘটে নি, এখনও পর্যন্ত কবরের মধ্যে থেকে কোন মৃতদেহ জীবন্ত রূপ ধরে বাইরে বেরিয়ে আসে নি। লাজোর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও কামারের হাতুড়ির আওয়াজের মত ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন তার কাছে এত বিচার বিবেচনার সময়ই বা কোথা! সে একবার মুখ তুলে তারার ঘোলাটে আলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো, তারপর ময়দানের পথে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

লাজোর মনে এই একটা ভয় ক্রমশ চেপে বসছিল যে খোলা ময়দানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় দূর থেকে ওকে যে কেউই দেখে ফেলতে পারে। তার শরীরে জড়ানো কাপড়টাও তো প্রায় শাদাই বলতে হবে। সেই অন্ধকারে তার নিজের শরীরের কাপড়ের জন্য নিজেরই ভয় করতে লাগল। কিন্তু এবার লাজো ময়দানের প্রায় ওপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সে ঘুরে পিছন দিকে দেখল একবার। সমস্ত ময়দান খাঁ খাঁ করছে, নির্জন। এবার কূয়ার নিশানার দিকে তাকিয়েই তার বুকে একটা কাঁপুনি উঠল! কেউ নেই কূয়ার ধারে কাছেও। রশীদ আসেনি। এবার! এবার তো আর কোন উপায় নেই তার! আবার গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে গিয়েও মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কূয়োর চারপাশে একবার চক্কর দিল সে। মনে মনে যেন এবার স্থির করেই ফেলল যে এই বিশ্ব-সংসারে যদি তার কোন স্থানই আর না থাকে তো এই কূয়োতে লাফিয়ে পড়েই সে প্রাণ বিসর্জন দেবে?

চাদরে ঢাকা সমস্ত শরীর নিয়ে এক ব্যক্তি ওপাশের একটা

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। 'বোন, তুমি কি লাজো?' সেই ব্যক্তি একেবারে লাজোর কাজে এসে চাদরের মধ্য থেকে মুখ বার করল।

'ভাই, আমার নিশানাটা দেখাও একবার।' লাজো সেই ব্যক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে কোনমতে উচ্চারণ করল। রশীদের মুখে চোখে অপার করুণাধারা। লাজোর বুকের কম্পন শান্ত হয়ে এলো। রশীদ নিজের হাতে পরা আঙ্গুলের আংটিটা দেখালো তাকে।

'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে কাল অথবা পরশু দিন পূরোকে নিয়ে যাব, বাচ্চা দুটো ওর কাছেই আছে।' বলে রশীদ আবার ঝোপটার আড়ালে গিয়ে বেঁধে রাখা ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে এল।

'হায় আল্লাহ!' রশীদ একবার কথাটা উচ্চারণ করেই দুহাতের সাহায্যে লাজোকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল।

ঘোড়া চলতে আরম্ভ করতেই রশীদের সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। যেদিন সে পূরোকে ছত্তোয়ানীর কাঁচা সড়ক থেকে তুলে নিয়ে এমনিভাবে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়েছিল। রশীদ ভেতরে ভেতরে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছিল। ফের একবার তাকে নিজের ঘোড়াকে এইরকম কাজে লাগাতে হল। গ্রামেরই এক নবযুবতীকে আবার ভাগিয়ে নিয়ে যেতে হল। যৌবনকালের সেই উৎসাহ এখন আর রশীদের দেহে মনে নেই। তাই রশীদ ভাবছিল যে পূরোকে উঠিয়ে নিয়ে ঘোড়া যেমন ছুটছিল, তার মনের ওপরও তেমন একটা ভীষণ ভার যেন পাথরের মত চেপে বসছিল, চেপে বসছিল একেবারে মন দাবিয়ে আত্মার ওপরও। কত বছর ধরে তার আত্মার ওপর সেই ভারী বোঝাটা চেপে বসেছিল। আজ যেমন তার ঘোড়াটা রত্তোবাল গ্রামের সীমা পার হয়ে দূরে সরে সরে যাচ্ছিল, রশীদের মনে হচ্ছিল যে তার আত্মার ওপর চেপে বসা সেই ভারী বোঝাটা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। ঘোড়াটা তখন যেন পক্ষিরাজ হয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই লাজোর গুম হয়ে যাবার খবরও সমস্ত গাঁয়ে প্রচারিত হয়ে গেল। দই ঘোটা সবে সুরু হয়েছে, মাখন এখনও ভালমত উঠে আসে নি, কিন্তু গাঁয়ের প্রতি ঘরেই মেয়েরা মাখন তোলার কাজ আপাততঃ বন্ধ রেখে লাজো সম্পর্কেই তুমুল তর্ক-বিতর্ক সুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে।

আশপাশের গ্রামের একটাতেও হিন্দুর নাম-নিশান পর্যন্ত ছিল না: আর কোন মুসলমান এমন কাজ করতেই বা যাবে কেন! লোকেরা সত্যিই বিহ্বল-বিস্মিত হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে।

রোদ্দুরের তেজও আজ যেন দৌড়ে দৌড়ে বাড়তে বাড়তে প্রখরতর দুপুরের দিকে এগিয়ে গেল। সব ঘরেই তখন উনুনের ওপর ডালের কড়াইতে ডাল ফুটে গেছে। মেয়েরা সব তখন তন্দুর গরম করে নিচ্ছিল, মাঝে মাঝে সেগুলো থেকে পটপট শব্দে আটা মাখা ছিটকে পড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে যেমন পড়ছিল সেই সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলীও পাক দিয়ে দিয়ে উঠে সমস্ত গ্রামের আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। সেই সময় পূরো গ্রামের মধ্যে পা দিল।

আজ লাজোদের ঘরের দরজা কোন মৃত পশুর হাঁ করা মুখের মত খোলা পড়েছিল। পূরো যখন সেই বাড়ির দরজার ভেতর পা রাখল, তো দেখল যে উঠোনে ডাঁই করা এঁটো বাসনকোষণের ওপর মাছি ভনভন করছে। পূরো দেখেই বুঝতে পারল যে আজ সকালে কেউই কিছু খায় নি এখনও।

'আরে, ও মেয়ে! তুই কোথাও সেই কালামুখীটাকে দেখলি?' বুড়ির মাথার ওপরটাতে এমন ধূলোবালি মাখানো যে দেখলেই মনে হয় যে কেউ হয়তো একটা মাটি ভরতি হাঁড়ি ভেঙ্গেছে বুড়ির মাথায়।

'কে আম্মা?' পূরো ওর মাথার ওপর থেকে খেসের গাঠরীটা নামিয়ে মাটির ওপরেই রাখতে রাখতে বলল।

'আরে, ওই চণ্ডালনীটা, আল্লাহতালা সেটাকে শায়েস্তা করবে।' বুড়ি ফের যত ঘৃণা ছিল তার মনে সব যেন মাথার ভেতর থেকে আছড়ে ফেলতে লাগল।

'হায়, হায়, কে? বউ কোথায় গেল!'

'ওই ঘরজ্বালানিই তো ভেসে গেছে।'

'হায়, হায়, কার সঙ্গে? আমি তো তার জন্যে কবচ আর পবিত্র ভস্ম নিয়ে এসেছি।'

'চুলোয় যাক কবচ আর ভস্ম! সেটাকে বোধ হয় জিনে নিয়েছে কি ভূতে নিয়েছে কে জানে।

'বল কি গো আম্মা!' গাঁয়ে এমন কে আছে যে তাকে নিয়ে যাবে! বাইরে ক্ষেতেটেতে গেছে হয়তো, এসে পড়বে এক্ষুনি।'

'ওই দেখ! শোন কথা! ক্ষেতে নাকি গেছে! রোদ্দুর চড়ে গেছে মাথার ওপর আর…'

'কিন্তু আম্মা! মেয়েটাতো আর রুটির টুকরো নয় যে কাকেরা ঠোঁটে করে নিয়ে যাবে!'

'আরে, আমিও তো তাই বলছি। কে জানে হয়তো কোন কুয়াতেই ডুবে মরেছে নাকি, নাকি কোন ঝিল-খালেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তো সেই প্রথম দিন থেকেই মেয়েটার ওপর কোন ভরসা রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু ছেলেটাই তো আমার ডগমগ করছিল, বলছিল, দেখ আম্মা! এখন এই মেয়েটা কোথায় যাবে, এর তো আপন-পর কেউই আর নেই।'

'কেন আম্মা! মেয়েটার মা-বাবা কোন গাঁয়ে থাকে?'

'উচ্ছন্নে যাক তার মা-বাপ; আমি তো পয়লা দিনই বলেছিলাম যে এই রকম অন্যের ইট দিয়ে নিজের ঘর-বসত তৈরী করা যায় না। কিন্তু ছেলের তো আমার মন পড়ে গেল মেয়েটার ওপর, মা বুড়ির কথা আর কে শোনে!… এই দেখ, তোর কাছে লুকোনোর কি আছে আর, সমস্ত গ্রামই জানে, মেয়েটা ছিল হিন্দুদেরই কন্যা। যখন গাঁ ছেড়ে হিন্দুরা সব পালাতে লাগল, তখন আমার ছেলেটা

না জানি একে কোত্থেকে নিয়ে এল। আল্লা সাক্ষী, আমি তো প্রথম দিন থেকেই বলছিলাম, সবায়েরই মেয়ে-বৌ থাকে, আল্লাদিত্যা, তুই ঝুটমুট পাপের গাঠরীটা ঘাড়ে নিলি, না জানি কবে, কেমন করে এই পাপ ঘাড় থেকে নামবে…'

'ও, এই ব্যাপার। তাই বল! সেই জন্যেই, আম্মা, মেয়েটাকে কেমন আমার শুকনো শুকনো লাগত। কিন্তু ভেগেই বা কদ্দুর যাবে? এখানে, আশেপাশে তার আপনজন তো কেউই নেই। কাকের হাত থেকে বাঁচলেও চিল ছোঁ মারবেই। আমার এখন মনে হচ্ছে যে সে বোধহয় কোন কূয়ো বা পুকুর-ডোবাতেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে কিনা। সে জেনে বুঝেই হোক বা অনিচ্ছাতেই আর কোন উপায় না দেখে।—'

'আমাদের ওপর থেকে কলঙ্কটা তো দূর হলো, তা যে ভাবেই যাক কিন্তু ছেলেটা তো আমার মাথা খেয়ে নিচ্ছে। কেবলই বলে যে তুমি তো অন্ধ হয়ে গেছ। তাই দেখতে পাওনি, পাখীর বাচ্চাতো আর ছিল না সে যে কেউ তাকে পকেট ফেলে লুকিয়ে নিয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, আম্মা! আগে কখনও বউ একা একা বাইরে কোথাও গিয়েছিল?'

'কই বাছা! সে আবার কোন মরার সঙ্গে পীড়িত করতে যাবে! প্রথম প্রথম তো আমি যখন ছেলেকে খাবার দিতে যেতাম ক্ষেতে তো বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যেতাম। তারপর ছেলে বলল আর আমিও ভেবে দেখলাম যে মেয়েটা আর কোথায়ই বা যাবে। কারো মাথার ওপর সর্বক্ষণ সওয়ার হয়ে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত ঘরেও তার মন টিকতে চাইবে না। তারপর থেকে ওই দুপুর বেলার খানিকটা সময়ই বা মেয়েটা একলা একলা থাকত এই বাড়ীতে। গতকালও যখন আমি ছেলেকে খাইয়ে ফিরলাম, তখনও এখানেই ভালমানুষের মত বসেছিল। রাতে খিচুড়ি বানালো, তরকারি বানালো, রুটি তৈরী করল, আমাদের মা-বেটাকে খাওয়ালো, নিজেও

খেলো। তারপর চারপাইটা আমার বাইরে থেকে ঘরে এনে দিল, বলল যে উঠোনে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ছেলে তো সামান্য মদ খেলো, যেমন খায়, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। এর মধ্যে কি হয়েছে, কখন হয়েছে, কিছুই টের পাইনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে যেমন ডাকতাম, ডেকেছি। কিন্তু কেউ থাকলে তবে তো জবাব দেবে।'

'কূয়ো-পুকুর টুকুর ভাল করে দেখা হয়েছে তো? সে মেয়ে কারো সঙ্গে ভেগে যাবে দেখে তো তেমন মনে হয় নি আমার।'

'আরে, ভেগে যাবে তো কার সঙ্গে!'—বুড়ি নিজের মাথাটা নামিয়ে নিজের দু'হাটুর ওপর রাখল।

'বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। মাংসের টুকরো তো আর নয় যে কুকুর বেড়ালে মুখে করে নিয়ে যাবে। গ্রামের মধ্যে তো খোঁজ খবর নেওয়া হযে গেছে?'

'হ্যাঁ সকাল থেকে গ্রামের সকলেই একবার না একবার এসেছে তারা সব তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। এখন তো আমার ছেলে আল্লা-দিত্যা আর গাঁয়ের কিছু ছেলে কূয়োগুলোতে খোঁজ করতে গেছে। যদি কোন মতে লাশটাও উদ্ধার করা যায় তো ছেলের মনে আমার এই সান্ত্বনা থাকবে যে মেয়েটা কোথাও ভেগে যায় নি অন্ততঃ ছেলের আমার বেঁচে বর্তে থাক, মেয়েমানুষের আবার অভাব কি....'

এ পর্য্যন্ত পূরোর মনে কখনও হর্ষ কখনও বা মুখে শোকের চিহ্ন ফুটে ফুটে উঠছিল, এবার দু দিন জন লোক বাইরে থেকে ভেতরে এলো।

'আমরা তো যত কূয়ো, পুকুর ডোবা সব দেখে এলাম। তার তো হাড়-মাংসের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।' বলতে বলতে তিনজনই উঠোনে রাখা খাটের ওপর বসে পড়ল।

'মা-বাপের মাথা খাক সে! তোরা কেন জানপ্রাণ দিয়ে এত তালাশ করতে গেলি! তুলে নিয়ে গেছে বোধ হয় কোন ভূত প্রেত।' বুড়ি তার ছেলে আল্লাদিত্যার দিকে তাকিয়ে খুবই

' কোমল স্বরে বলল। পুরো বুঝতে পারল যে কোন জন আল্লাদিত্যা।

পুরোর মনে পড়ল লাজোর বিষণ্ণ চেহারাটা। ওর মনে হলো যে লাজোর সুন্দর মুখখানা এই পিঞ্জরে বদ্ধ পাখীর মত তাকে এই নোংরা চিলের ধারালো নখওয়ালা পাঞ্জার মধ্যে থেকে অসহ্য কটা দিন কাটাতে হয়েছে।

'আমার তো মনে হচ্ছে যে রাত বিরেতে বেরিয়ে সে বাইরে গিয়েছিল, তখনই কোন জানোয়ার তাকে তুলে নিয়ে গেছে।' তিন-জনের একজন লোক আল্লাদিত্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল।

'গাঁয়ের মধ্যে গীদড় বা লোমড়ি ঘুরে বেড়ায় ঠিক, কিন্তু আর কোন্ বড় জানোয়ার এই গাঁয়ের ভেতর আসবে!' পাশে বসা অন্যজন বলল।

'আমার তো মনে হচ্ছে কোন চোরই হয়তো তুলে নিয়ে গেছে। তা যাক গে। তুই এখন উঠে একটু কিছু খেয়ে নে তো। সকাল থেকে তো পেটে কিছু দিস্ নি।' বুড়ি নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল। তারপর উঠে খাবার জোগাড়ে লেগে গেল।

'আচ্ছা আম্মা! আল্লা তোমার মনে শান্তি দিক। আমি এখন চললাম।' পুরো কথাগুলো বলে খেসের গাঠরীটা তুলে মাথায় নিয়ে নিল।

'তুই কে রে? ও মেয়ে?' আল্লাদিত্যা পুরোর দিকে সন্দেহের দৃষ্টি ফেলে বলে উঠল। এতক্ষণ পুরোকে গ্রামেরই কোন স্ত্রীলোক ভেবে তেমন একটা মনোযোগ দেয় নি সে। এখন খেসের গাঠরীটা তুলতে দেখেই হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল।

'কে মানে? আরে এতো খেস ফিরি করে বাড়ী বাড়ীতে। আবার কে।' পাশেই দাঁড়ানো বুড়ি উত্তর দিল।

'আমি আগে তো কখনও তোকে এই গাঁয়ে দেখি নি?' আল্লা-দিত্যা ফের সন্দেহ ভরা স্বরে প্রশ্ন করল।

'কতদিন ধরেই তো এই মেয়ে বেচারি এখানে ফিরি করে বেচছে?' বুড়ি এবার ছেলেকে ধমকের স্বরে বলল।

'কিন্তু তুই কোন্ গ্রাম থেকে এসেছিস ?' আল্লাদিত্যা পুরোর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ঈষৎ রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'দু দুটো বাচ্চা ছেলে আমার। গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে দু'চার পয়সা কামাই করি।' পূরোর মনের ভেতর তোলপাড় করে উঠে মনে হচ্ছিল যে পাখা মেলে এই মুহূর্তে উড়ে চলে যায় এখান থেকে। কেন ও এই গ্রামে রয়ে গেল এখনও ? রাত্রেও যদি তাদের সঙ্গে চলে যেতো তো কে আর ওর খোঁজ খবর পেতো !

'কিন্তু তুই হিন্দু না মুসলমান ?' আল্লাদিত্যার সন্দেহ এখনও ঘোচেনি। তার দুজন সঙ্গী মুচকি মুচকি হাসছিল।

'কি ভাই, মতলবটা কি ? একেই কি এবার এই ঘরে তুলবে না কি ?' আল্লাদিত্যার পাশে বসা এক বন্ধু টিপ্পনি কেটে বলে উঠল।

'কি বলছ, ভাই ! এখানে আমি আবার হিন্দু এলাম কোত্থেকে ?' বলে পূরো পায়ের জুতো জোড়া গলিয়ে গাঠরীটা সামলে চলতে আরম্ভ করল।

'হিন্দুর নাম তো আর তার কপালের ওপর লেখা থাকে না।' আল্লাদিত্যা ফের জোর দিয়ে বলে উঠল।

'তোমার তো ভাই, সন্দেহ দূর হচ্ছে না কিছুতেই। এই দেখ, আমার নাম হমিদা।' বলে পুরো সদরের কাছে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের ওপর উল্কি করা নাম দেখিয়ে দিল।

'যা, ভাই, যা, এর তো মাথাটাই খারাপ হ'য়ে গেছে।' বুড়ি বলে উঠল।

'আমি যদি খোঁজ টোজ পাই, তাহলে নিজে এসে তোমাকে জানিয়ে যাব, আম্মা !' বলতে বলতে অতি দ্রুত পায়ে পুরো গলির রাস্তা ধরল। বাবলীর পাশের কুঠুরিতে ও বাচ্চা দুটোকে রেখে এসেছিল। জাবেদ এখন বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছে তো, তাই ছোট ছেলেকে সে-ই সামলে রেখেছে।

পূরো সেই রাত্তিরটা প্রহর গুণে গুণে কাটিয়ে দিল। দ্বিতীয়

দিনের সকালেই লাজোকে সক্কড়আলীর বাড়ীতে রেখে রশীদের এখানে চলে আসবার কথা। সেই রাতই রত্তোবাল গ্রামে পূরোর জীবনের শেষ রাত্রি কাটানো। পূরো আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছুটো বাচ্চাকে নিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে দিল চৌকিতে শুয়ে।

আজ রত্তোবালে পূরোর সব কামনাই সার্থক হয়েছে। প্রথমবার রত্তোবালে আসার কথা মনে পড়ল ওর। ক্ষেতে ক্ষেতে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোর কথা মনে পড়ল ওর। শেষদিন রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও মনে পড়ল···সেবার ও রামচন্দ্রের ক্ষেতই শুধু দেখেছিল, এইবার পূরো রামচন্দদের সেই বাড়িও দেখল, সেই ভেতর বাড়ীর অঙ্গনটাও দেখল, যা দেখার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা কত বছর ধরে ও বুকের নিভৃত কোনে লালন করে আসছিল। পূরো ভাবতে লাগল: ঐ বাড়িতেই তো ওর বউ হয়ে আসবার কথা ছিল, সেই ঘরে ওরই নিজের ভগ্নী বউ হয়ে এলো, ঐ বাড়িতেই ওর ভাই বর হয়ে বরযাত্রীদের নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ও সেই বাড়ীর মুখ দেখল তখন, যখন ঐ বাড়িতে, বাড়ির আপনজন যারা, তাদের ছায়াটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। কেবল ও দেখল লাজো নামে মেয়েটা ঐ বাড়ির খাঁচাব মধ্যে বন্দিনী।···ঈশ্বরের অসীম দয়া, লাজোর কয়েদের মেয়াদও শেষ হয়ে গেল। ওর মনে ফের ভাবনা জাগল আর শিউরে উঠল ভাবতে ভাবতে, কেন না, আজ তো নিজেই ঐ বাড়ির পিঞ্জরের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে প্রায় বন্দিনী হতে চলেছিল, কেবল হাতের ওপর উল্কি করা 'হমিদা' নামটা ওকে বাঁচিয়ে দিল।

বুঝতেও পারল না পূরো যে কখন এইসব ভাবতে ভাবতে ওর চোখ ছুটো অশ্রুজলে বুঁজে গিয়েছিল, আর সেই ফাঁকে রাতের অন্ধকার উধাও হ'ল। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

যাওয়া আসার ভাড়া কবুল করে রশীদ এক্কাগাড়ী নিয়ে রত্তোবাল গ্রামে এসে পূরো আর তুই ছেলেকে নিয়ে সক্কড়আলী গ্রামে ফিরে এল।

লাজোর তুটি বড় বড় চোখ যেন বাইরে থেকে বন্ধ করা দরজায় স্থির হয়ে ছিল। সে পূরোদের আসার এক্কাগাড়ীর শব্দ শুনেই এক লাফে উঠে বন্ধ দরজার ভেতর দিকের খিলটা খুলে দিল। রশীদ যাবার সময় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে গিয়েছিল যাতে গ্রামবাসী কারো কোনরকম সন্দেহ না পড়ে। ভেতরে এসে দরজার খিলটা আবার ভাল করে বন্ধ করে, পূরো, লাজো আর রশীদ বাড়ির একেবারে সবচেয়ে পেছন দিককার ঘরটাতে এসে এমনভাবে বসল যেন বাঘের ভয়ে হরিণের দল লুকিয়ে থাকার মত একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে গেছে।

লাজো আর পূরো তুজনেরই মনে হচ্ছিল যেন আজন্ম তারা একসঙ্গে খেলাধূলো করেছে, একই সঙ্গে পালিত হয়েছে, একে অপরের অভিন্ন আত্মার মত তুজনেই, কিন্তু সময়ের ফেরে কতবছর ধরে তারা পরস্পরের কাছ ছাড়া হয়ে গেছল, তারপর আজ কোন ভয়ঙ্কর ঝোড়ো বিপর্যয়ের পর, প্রচণ্ড এক ঘুর্ণিবাত্যা থেকে পরিত্রাণ পাবার পর, তুজনের আবাব আপনা আপনিই মিলন হয়েছে। কত বছরের বিরহ আর বিচিত্র জীবনেব কত না কাহিনী তুজনেরই— বুকের মধ্যে প্রাচীন বরফের মত জমে আছে। তুজনেই নিজের কথা বলতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তুজনেই একে অপরের কাহিনী শুনতেও অধীর হয়ে উঠেছিল।

খাওয়া দাওয়া মিটতে মিটতে বেলা বেশ চড়ে গেল।

রশীদ এটা বেশ স্পষ্টই বুঝেছিল যে তাদের তুজনকে একলা নিরালায় বসে পরস্পরের যা যা বলার তা বলে এবং শুনে নেওয়া

দরকার। বস্তুতঃ রশীদের মনে সুরু থেকেই কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। সে ভাবত যে পূরোর সঙ্গে তার দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রয়েছে, নচেৎ সে অত খারাপ লোক নয় যে পথ চলতি কোন ভদ্র ঘরের বোন বা মেয়েকে জবরদস্তি করে নিজের ঘরে এনে আটকে রাখবে। পূরোকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পাবার পর রশীদ কখনও আর কারও ভগ্নী বা কন্যার দিকে চোখ তুলেও দেখে নি।

ছেলে দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে ওরা দুজন ভেতর দিকের একটা ঘরে খাট পেতে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। রশীদ সেদিন বাইরের বারান্দাতেই ঘুমলো।

'রত্তোবাল থেকে যে দলটা চলে গেল, তারা এই গ্রামের ওপর দিয়েই গেছে।' পূরোই কথা বলতে আরম্ভ করল।

'তুমি দেখেছিলে!' লাজো আর পূরো এ পর্য্যন্ত একান্তে বসতে পারি নি। লাজো এখনও জানে না যে পূরো তাকে কেন আর কিভাবে খুঁজে বার করতে পারল।

'আমি তোর ভাইয়ের দেখা পেয়েছিলাম। তখনই তো তোর খবর পেলাম আমি।'

'অ্যাঁ! সে কি!...'

'হ্যাঁ।' বলতেই সেই দলের মধ্যে থেকে রামচন্দের মুখটা পূরোর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'তুমি তাকে চিনলে কি করে? তুমি তো তাকে কোনদিন দেখনি পর্য্যন্ত!' লাজোর মনে কত-শত কথাই যে ভিড় করে আসছিল। কিভাবে দাদার সঙ্গে পূরোর সগাই (পাকাদেখা) হয়েছিল, কিভাবে দাদার বিয়ের বিরাটভাবে প্রস্তুতি চলছিল, তারপর কিভাবে যে পূরো একদিন গুম হয়ে গেল; তারপর পূরোর ছোট বোন তাদের বাড়ীতে বউ হয়ে এল কিভাবে।...

'আমি তাকে একবার আগেও দেখেছিলাম।' পূরো তখন রত্তোবাল গ্রামে সেই ক্ষেতের মধ্যে দুজনের সাক্ষাতের কথা লাজোকে সব বলল। পূরো তারপর এও বলল যে তখনও কিন্তু ও

জানতো না যে রামচন্দ অবশেষে ওর ভগ্নীপতি হয়ে গেছে।

'আমি সেই ঘটনার পর কারো কোন খোঁজ-খবর তো আর পাই নি। কেবল যেদিন সেই কাফেলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল···মৃত ব্যক্তিকেও এক সময় না একসময় লোকে স্মরণ করে, তাদের শ্রাদ্ধ-শান্তি তো করেই : তা ভাবলাম যে কোন না কোন সময় কেউ না কেউ হয়তো আমার নামটাও একআধবার উচ্চারণ করে?' বলতে বলতে পূরোর গলার স্বর ভারী হযে এল।

লাজো তখন বলল যে ওর বাবা বছব দুয়েক আগে মারা গেছে। ওর মা মাঝে মাঝেই ওর নাম করে কাঁদে।

'মার যেমন ভাগ্য, বেঁচে থেকেই দেখতে হল যে মেযেও মরল আর বউও রইল না।' কথাগুলো বলল পূরো কাঁদতে কাঁদতে. লাজোও চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। দুজনে কতক্ষণ কাঁদল।

কসাইখানায় বদ্ধ থাকা দুটি অবলা প্রাণীর মত দুজনেই তারা খাটের ওপর পড়ে রইল।

'তুই যখন সেখানে যাবি, মায়ের সঙ্গে তো আমার দেখা হবেই তোর, তো তখন মাকে বলিস যে একবার যেন এই হতভাগীর মুখটা একটু দেখে যায় অন্ততঃ ' পূরো অধীর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'আমি আমি ওখানে কোথায় যাব ·'

'তুই নিজের ঘরে যাবি, স্বামীর কাছে যাবি, নিজের ভাইয়ের কাছে যাবি।'

'আমি বেঁচে থেকেই মরে গেছি, এখন আমাকে কে আদর করে নিয়ে যাবে?'

'না লাজো, আমি বেঁচে থাকতে এবকম অন্যায় হ'তে দেব না। তুই তোর নিজের ঘবে যাবি। এর মধ্যে তোর দোষটা কোথায়?'

'কিন্তু তোমারই বা দোষটা কি ছিল? তোমাকে তো বাড়ীর কেউই আজ পর্যন্ত ডেকে নিয়ে গেল না!'

'আমার ব্যাপারটা অন্যরকমের লাজো!'

'কিভাবে অন্যরকম ছিল তোমার ব্যাপারটা? তুমি কি নিজের মর্জি মত চলে এসেছিলে? তুমিও তো…'

'হ্যাঁ, লাজো! কারণ, তখন আমিই ছিলাম একা এক মেয়ে। আমার মা বাবার সাহসই ছিল না যে পড়শীদের কথা উপেক্ষা করবে। সে জন্যেই যত মায়া-মমতা তাদের ছিল জোর করে তারা সেসব মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর আজ! আজ তো কারো একার বুকে বাজেনি, সব্বার বুকেই ব্যথা বেজেছে। আজকের অবস্থা একেবারেই অন্যরকম।'

'না, পুরো! আমার ভাগ্য যদি ভালই হতো তো শুরুতেই আমার ওপর এত অত্যাচার হ'তো না। আমি জানি যে কেউই আর আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবে না।'

'আমি বলছি যে তোর ভাইয়ের চিঠি নিশ্চয়ই আসবে। আমরা তোর খবর তাকে দিয়ে দেবো। দেখিস, সে তোকে নিয়ে যাবার জন্যে নিশ্চয় আসবে। হ্যাঁরে, আমার ভাইটাকে কেমন লাগে দেখতে?'

অধীর আগ্রহে প্রশ্নটা করল পুরো।

লাজোর চোখের ওপর নিজের স্বামীর মুখটা ভেসে উঠল। কেমন করে সে ওই মুখ আবার দেখতে পাবে, কি করে সে আত্ম-স্বজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। লাজো কেবল ভাবতেই থাকে, কোন কূল-কিনারা দেখতে পায় না। কারণ, এখনও তার মনে স্থির বিশ্বাস যে কেউ আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবে না। মনে মনে যতই না কেন সে মণ্ডা মিঠাই ভাগ বাঁটোয়ারা করুক।

'না রে, লাজো! আমি বলছি, তোকে নিতে কেউ নিশ্চয়ই আসবে। আজ আর কারো বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ তো নেই। সকলেই যে যার মেয়ে, বউকে খুশী মনে নিয়ে যাচ্ছে। রশীদ বলছিল যে ওপার থেকেও খুঁজে খুঁজে লোকেরা যার যার নিজেদের স্ত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। কারও কারও তো এমন কি কোলে বাচ্চা পর্যন্ত এসে গেছে!' বলে শুনে দুজনেই কেমন

চুপচাপ হয়ে গিয়ে বুঝি বা সেইসব মেয়েদের অসহায় অবস্থার কথাই ভাবতে লাগল।

লাজো ভাবতে লাগল যে আজ পর্যন্ত তার ঘরে বাল-বাচ্চা হয় নি। কে জানে কি দোষ আছে তার মধ্যে। আজ সেই দোষই তার উপকার করল। না হলে তারও যে কি দুর্দ্দশা হতো কে জানে।

'যখন তারা একজনের জন্য কাঁদতে পারছে তো দুজনের জন্যেও পারবে। আমি কোথাও যাবো না, পুরো! কোন্ মুখ নিয়ে যাব আমি। আমি তোমার ছেলে দুটোকে মানুষ করে তুলব। না হয় কটা রুটি আমার জন্য ব্যয় করবে।'

'এভাবে বলছিস কেন, লাজো! আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিস নি। এই ঘর তোরও নিজেরই ঘর মনে করবি। কিন্তু লাজো। তারা তোকে অবশ্যই নিয়ে যাবে। আমি সারাজীবনের দোহাই দিয়ে তাদের রাজী করাবোই করাবো।'

পুরো লাজোকে নিজের দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

'তুমি তো নিজের ঘরে বেশ খুশীই আছো তাই না পুরো?'

'রশীদ এখন আর তেমন নেই। প্রথমেই যে অন্যায় পাপ সে করেছে তা তো করেইছে; কিন্তু তারপর থেকে সে আমাকে কখনও, ভুলেও, ভাল-মন্দ কিছুই বলেনি। সে যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে না থাকত, সাহায্য করত, তাহলে তোকে আমি কি করে খুঁজে নিয়ে আসতে পারতাম?'

'আমাকে নিয়ে আসতে গিয়ে সে নিজের জীবনকেই বিপন্ন করে ফেলেছিল। যদি কোন ক্রমে ঐ রাক্ষসটা জানতে পারতো তো তাহলে সে আমার হাড় মাংস জ্বালিয়ে দিয়ে তবে জলগ্রহণ করতো…

'ওরা হাড় মাংস জ্বালাবে কেন রে পাগলী। ওরা তো মাটিতে পুঁতে ফেলে।'

'সে যাই হোক। কিন্তু, পুরো, এই গ্রামে আবার খোঁজ নিতে

চলে আসবে না তো? আমার তো বুক কাঁপে, আমার জন্যেই না জানি আবার তোমার সাজানো সংসারটা উজাড় হয়ে যায়।'

'এখনও পর্যন্ত তো তোর ছায়াটুকুর খবরও কেউ পায়নি।' বলে ও লাজো হারিয়ে যাবার পর সেই বুড়ি আর বুড়ির ছেলের সঙ্গে ওর দেখা হওয়া থেকে সব বর্ণনা করে গেল।

'তোর আগে এই পিছনদিকের ঘরটাতেই আমি কয়েকটা দিন একটা হিন্দু মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ের বাতাসটুকুও আর কারো গায়ে লাগতে দিইনি। কেউ কোন খোঁজও পায়নি। তারপর সেই শেষদিন আমি তাকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফেলাতে রামচন্দের কাছে দিয়ে এসেছি। তোকেও এখানে এই ভেতর কুঠুরিতেই চুপিচুপি রেখে দেব, যাতে গাঁয়ে কোন কথাবার্তা না হয় তোকে নিয়ে। তারপর যেদিন চিঠি-পত্তর যা হোক আসবে, তোকে চুপটি করে গিয়ে গিয়ে লাহোরে পৌঁছে দেবো। তোর কথা বা খবর কারো কানেও কোনদিনও পৌঁছবে না।'

'যদি তার কোন চিঠিই আর না আসে...'

'আমার মনে কেবলই এই বিশ্বাস জেগে আছে লাজো। তোর দাদা অবশ্য চিঠি লিখবে আমার কাছে।'

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল, ভোর হয়, সন্ধ্যে আসে। না লাজোর কোন খবর বাইরের কারো গোচরে আসে, না আসে লাজোর আত্মস্বজনের দিক থেকে কোন রকম সংবাদ। এমনিতে পূরো আর লাজো সব সময় একত্রই থাকে। রাতে যখন চোখ তাদের নিদ্রায় ভারী হয়ে আসে, তখন তাদের দুজনেরই চোখের পাতায় স্বপ্নরা সব নেমে এসে ভীড় করে। অন্ধকারে পরস্পরের মুখও দেখা যায় না এমন ভোরের সময় থেকে তারা দুজন কথা বলতে সুরু করে। যে যার স্বপ্নের ভালমন্দ চুলচেরা বিচারে মগ্ন

হয়। কখনও কখনও তাদের দুজনেরই মন যেন ধন্দে পড়ে যায়; আবার স্থির মনে বসে একান্তে চিন্তা করতে থাকে। কতদিন লাজো নিজে থেকেই উনুনের মধ্য থেকে পোড়া কয়লা বার করে নিয়ে বাচ্চা ছেলেদের মত মাটির বুকেই আঁকিবুঁকি কাটতে থাকে। কখনও শুভযোগ আসে, কখনও বা আসে অশুভ যোগ। আঁকিবুঁকি তবু সে কাটতেই থাকে। কখনও কথা বলতে বলতেই লাজোর দুচোখ বয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে; কখনও বা পূরোর ছেলেদুটোর সঙ্গে খেলা করে করেই সময় কাটিয়ে দেয় সে, মনকে দেয় সান্ত্বনা। স্বভাবতঃই লাজোর মুখে সবসময়ই নিরাশ করা কথা ভীড় করে আসে। কারণ, এমন কোন আশাই তো তার ছিল না যে কেউ যেচে এসে কখনও তার কুশল সংবাদ নেবে। কিন্তু পূরোর মনে কিন্তু একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একদিন ঠিক কেউ একজন চুপটি করে চলে আসবে এখানে, অথবা কোনদিন হঠাৎ কোন চিঠি-পত্র এসে পড়বে, আর লাজো মেয়েটার ভাগ্য খুলে যাবে। পূরো নিজের দিক থেকে লাজোর প্রতি আতিথ্য-আপ্যায়নের কোনরকম ত্রুটিই রাখেনি। ওর মনে এই ভাবনাটাই জোরদার ছিল যে লাজো মেয়েটা মাত্র কিছুদিনের জন্য ওর কাছে অতিথি হয়ে আছে, এরপর বাকী জীবনে আর কোনদিনই হয়তো দেখা হবে না। তাই লাজোর মুখের মধ্যেই ও সকল আপনজনের রূপ দেখতে পেতো। আর কেই বা ওর ঘরে আতিথ্য নিয়ে এসে থাকবে, বা কে আর ওর সঙ্গে নিছক দেখা সাক্ষাৎ করতে আসবে! ওর একান্ত আপনজনদের মধ্যে লাজোই ওর প্রথম এবং শেষ অতিথি হয়ে এই ঘরে এসেছে।

দিনের বেলা কখনও লাজো দরজার খিল লাগিয়ে রাখত না। রাতের অন্ধকারই একমাত্র লাজোর আসল পরিচয় সবার কাছ থেকে গোপন রাখতো। কিন্তু গ্রামের পিওনরা তিন পয়সার একটা পোষ্ট-কার্ড কখনও ভুলেও ফেলে গেল না এই বাড়ীর ভেতর।

লাজো আর পূরো দুজনের মুখেই চিন্তার গাঢ় প্রলেপ পড়তে

লাগল। লাজোর মনে অন্ততঃ এই সান্ত্বনাটুকু ছিল যে পূরো আর রশীদ দুজনেই তাকে কখনও মনভার করে বসে থাকতে দিত না। আদর সোহাগ দিয়ে তাকে খুশী করে রাখত সবসময়। কিন্তু দিনের পর দিন লুকিয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া মনে লাজো ভাবতো যেন পাহাড়ের মত এই সময়ের বোঝা তার মাথা ওপর গ্যাঁট হ'য়ে চেপে বসে আছে। এই প্রতীক্ষার দিনগুলি কবে যে শেষ হবে!

পূরো কারো সঙ্গে বা বাড়ীতে গিয়ে মেলামেশা করত না। লাজো তো পিছন দিককার ঘরেই ওঠ বোস করত। দুপুরের দিকে কোন কোন দিন বাইরের দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিয়ে দুজনেই চককায় সূতো কাটতে বসে যেতো। দিন তো কেটেই যেতো। কিন্তু তাদের চিন্তার সূত্র যেন আর কাটতেই চাইত না।

শীতের সময় শেষ হয়ে গেল। ফাল্গুন মাসের দিনগুলো শেষ হয়ে এলো। জল আর এখন তত ঠাণ্ডা ছিল না। একদিন গড়ানো দুপুরের দিকে রশীদ যখন বাইরে থেকে দরজা ঠেলে ভেতরে এল তো লাজো আর পূরোকে দেখেই তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

খানিকটা থতমত খেয়ে দুজনেই তার কাছে এগিয়ে এল। কয়েকটা মিনিট সে কিছু বলতেই পারল না। লাজোর মনে হচ্ছিল যে কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে আনছে। মনে তার সেই এক ভয়, বুঝিবা রত্তোবালের সেই বুড়ি আর তার বেটা লাজোর ঠিকানা কোন ক্রমে জানতে পেরে গেছে। তারা এবার তাকে জবরদস্তি করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে! পূরোর মনে যে কি ঝড় উঠেছিল তা সে জানতেও পারল না।

রশীদ খাটের ধারে বসে পড়ল। জামার হাতা দিয়ে দুচোখ মুছে সে লাজোর পিঠে আদরের মৃদু চাপ দিতে লাগল। তার হাতের কোমল স্পর্শ ছিল, যেমন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার সময় বাবা তার মেয়ের পিঠে স্নেহের আদরের হাত বুলিয়ে দেয়, আদরিণী কন্যাকেই প্রবোধ দেয়, নাকি নিজের দুচোখ বয়ে উপচে আসা অশ্রু ধারা রোধ করতে নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়! রশীদের বুক স্নেহধারায়

উপছে পড়ছিল। সে কোন মতে নিজের মনকে বেঁধে স্থির স্বরে বলল, 'আজ রামচন্দ্র এসেছে।'

'এখানে?' লাজো আর পূরো একসঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ। সঙ্গে হিন্দুস্থান থেকে কয়েকজন পুলিশ এসেছে। পাকিস্তানেরও কয়েকজন সিপাই আছে। লোকেরা এভাবেই গ্রামে গ্রামে আর শহরে শহরে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের খোঁজ করছে। রামচন্দ্র একা আমার সঙ্গে দেখা করেছে।' রশীদ বলছিল।

'সত্যি সত্যিই আমাকে নিতে এসেছে?' লাজোর মুখ দিয়ে অকস্মাৎ কথাগুলো বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই অবশ্য লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে হল খামোখা একটা অনাবশ্যক প্রশ্নই সে করে ফেলেছে।

'পাগলী কোথাকার। তা না হলে এতদূর সে কি করতে এসেছে?' রশীদ ঈষৎ হেসে বলল।

পূরো এযাবৎ চুপ করে বসেছিল। ওর নিজের হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে যে প্রসন্নতা অনুভূত হচ্ছিল তার তুলনা নেই, কেন না, ওর এত দিনের দৃঢ় বিশ্বাস আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। ও জানতো যে রামচন্দ্র আসবে, ও জানতো যে ওর বৌদি ঠিক তার নিজের স্বামীর বাড়ীতে পৌঁছে যাবেই। লাজো তো খামোখাই নিরাশ হয়ে পড়তো। যেদিন যেদিন রশীদও কেমন নিরাশ হয়ে পড়ত, তখনও পূরোর মনের মধ্যে কে যেন জোর দিয়ে দিয়ে বলত যে-রামচন্দ্র অবশ্যই আসবে। তো আজ সেই দিনটা এসেই গেল। রামচন্দ্র সত্যি সত্যিই এসে পড়েছে।

'একলাই এসেছে বুঝি?' লাজো জিজ্ঞেস করল।

রশীদ বুঝতে পারলো যে লাজোর এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ কি। বলল, 'হ্যাঁ, এখন তো একাই এসেছে। তবে তুমি চিন্তা করো না। তোমার ঘরের সব আপনজনেরাই তোমাকে আদর করে, মাথায় তুলে নেবে।'

লাজোর মন কিছুটা অন্ততঃ শান্ত হয়ে এল।

'তোমার নাম শুনে, তোমার খবর শুনে রামচন্দ কেবল কাঁদতেই লাগল। কিছুতে তার চোখের জল থামতে চাইছিল না। তার দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরেও কান্না উথলে উঠে আসতে চাইছিল। বলতে বলতেই রশীদের চোখেও জল ভবে এলো। লাজো আর পুরো ছজনেই কাঁদছে।

আমি তাকে ভাল করে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়েছি। আজ তোমাকে যদি প্রকাশ্যে ওদের হাতে তুলে দিতাম তো সমস্ত গ্রামে জানাজানি হয়ে যেতো। কে জানে কথা শেষে রত্তোবাল গ্রামেও পৌঁছে যেতো তো বিপদ হতে পারতো। আমি তাকে বলেছি যে তুমি ফিরে যাও লাহোরে! আমি মেয়েকে নিয়ে লাহোরে পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানেই মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেব।'

'এটা খুব ভাল করেছ।' পুরো বলল।

'আমরা ওখানে আজ থেকে পাঁচদিনের দিন পৌঁছব। এর মধ্যে সে অমৃতসর থেকে পুরোর ভাইকেও খবর দিয়ে আনিয়ে নেবে। ভেবে দেখলাম, একবার পুরোও ওর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে নিক।' রশীদ লাজোর পিঠে তার কোমল হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আর্দ্র স্বরে বলছিল।

এতক্ষণের চেপে রাখা কান্না এবার আর্ত শব্দে বেরিয়ে এল পুরোর গলা চিরে। লাজো পুরোর কোলে মাথা গুঁজে দিয়ে ছহাতে ওকে বেড় দিয়ে ধরল। ছজনে ছজনের মধ্যে যেন মিশে গেল এক হয়ে; ছজনেই একে অপরের ছুঃখ-যন্ত্রণার ভাগীদার হয়ে গেল, ছজনের অশ্রুই যেন আপোষে মিলে মিশে গেল।···

···লাহোরের দূরত্ব এখান থেকে দিন দেড়েকের মত। তারপরও হাতে তিনটে দিন থেকে যাবে।

পরদিন পুরো বেসন আনালো। এক সঙ্গে জমানো মোষের ছুধের থেকে তোলা মাখন সব বার করল। বাদাম আর মেওয়া মিশিয়ে সারাদিন ঘরে পুরো লাড্ডু বানালো। যেমন মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাবার সময় করা হয়, পুরো তাই একটা রেশমের

জোড় বার করলো। লাজোকে ও বার বার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বার বার কাঁদে।

তৃতীয় দিন দুই ছেলেকে নিয়ে পূরো লাজো আর রশীদ ভোর বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে গ্রাম ছেড়ে ষ্টেশনে এসে রেলে চেপে বসল।

গত চারদিন ধরে পূরোর মনে অনেক রকমের চিন্তাভাবনা জেগেছে। চিন্তা করতে করতে রাতগুলো বিনিদ্র কেটে গেছে। পূরো নিজের মনে মনে দৃঢ় স্বরে বলে, 'আমি লাজোকে বলব, আমার মাকে গিয়ে বলো, একবার যেন এই হতভাগীর মুখটা একটু দেখে যায়—' ভাবতেই পূরোর গলা অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে আটকে যেতো, মনের মধ্যেই ভেবে ভেবে অনেক কথা বলবার জন্য ছটফট করে উঠতো; তারপর ভেবে ভেবে কূল কিনারাহীন তীরে দাঁড়িয়ে কোন কথাই আর মুখ দিয়ে বেরুতো না।

লাজোর তো নিজের ভাই আর স্বামীর মুখ দেখতে পাওয়াটাই এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা বলে মনে হচ্ছিল। এ যেন অনেকটা কারও মরে গিয়ে ওপারের কোন পৃথিবীতে গিয়ে কারও দেখা পাবার আশা করার মত। যদিও লাজোর এই হারিয়ে যাওয়া, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র পাঁচ-ছ' মাস আগে ঘটেছে, তবু তার মনে হচ্ছিল যে সে একবার মরে গিয়ে আবার পৃথিবীতে পুনর্জন্ম পেয়ে গেছে।

সারাটা রাস্তা দুজনের মনে এইরকম আগুপিছু চিন্তা তরঙ্গের মত ওঠানামা কবতে থাকল।

একটি মুহূর্ত

পুলিশের পাহারার মধ্যে থেকে যখন ওদের সাক্ষাৎ হলো, লাজো যেন চোখ উচিয়েও ওঠাতে পারছিল না। পূরো ওর ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। মিলনের এই একটি মুহূর্তে অন্যদিকে

তাই অসীম বিচ্ছেদই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কারও অশ্রুই আর বাধা মানছিল না।

শক্ত মনের পুরুষদের হৃদয় ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বাস্তব অবস্থার যে পাহাড় তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়েছিল, তাতে কাউকেই আর কোন প্রশ্ন করার কিছু ছিল না। কেঁদে কেঁদে তারা নিজেদের বুক-হাত সিক্ত করে ফেলল, কেঁদে কেঁদে তারা পরনের কাপড়-জামাও ভিজিয়ে ফেললো।

'আমার কথাটা মনে রেখো, ভাই। কখনও ভুল করেও লাজোর কোন রকম অনাদর করো না।' প্রথমে পূরোই কথাকটা বলতে পারল।

লাজোর স্বামীর মুখও ঝুঁকে পডেছিল, লাজোর ভাইয়ের মুখও অবনত।

'পূরো, আমাদের আর লজ্জা দিও না।' লাজোর ভাই উত্তর দিল।

লাজোর স্বামী কিছুই বলতে পারলো না। বোধ হয় সে কিছু শুনতেও পায়নি। আজ সে কেবল নিজের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকেই দেখতে পেলো না, দেখতে পেলো তার জ্ঞান হবার আগেই যে দিদি হারিয়ে গেছলো তাকেও। কতদিন ধরে, সেই তখন থেকে একটা আগুন তাকে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ করে দিচ্ছিল, যার একটা স্ফুলিঙ্গ সে রশীদদের ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, যার ফলে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছল। অনেক বছর ধরে সে সেই রাজকুমারীর গল্প সম্বন্ধে ভেবে আসছিল, যাকে একটা দৈত্য চুরি করে নিয়ে গেছলো, তারপর পূর্বদেশের এক রাজকুমার তাকে তার জাতুর তীর দিয়ে মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। ছোটবেলায় কোন সাধুসন্ত দেখলেই সে অমনি একটা জাতু-তীর চেয়ে বসতো। বড় হয়ে ওঠার পর দিদির জন্য চিন্তায় ও ব্যাকুল হয়ে উঠতো। আজ কত বছর আগে হারিয়ে যাওয়া দিদি তার চোখের সামনে বসে আছে। এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল যে রশীদ তার পত্নীকে বাঁচিয়ে এনেছে,

উদ্ধার করেছে ; এই মুহূর্তে তার কেবল এটাই মনে পড়ল যে এই রশীদই তার বোনকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল।

পুলিশের লরি প্রস্তুত। হিন্দুস্তানী পুলিশরা চেঁচিয়ে বলল : 'ওদিকে যাবার জন্য হিন্দুরা আলাদা হয়ে যাও। লড়ি এবার ছেড়ে দেবে।'

রামচন্দ বার বার রশীদকে বুকে জড়িয়ে ধরছিল আর বারে বারে বলছিল : ভাই, তোর বড় দয়ার শরীর, আমি তোর উপকার কখনও ভুলে যাব না।' রশীদের মুখে উপকার করতে পারার প্রসন্নতা তো ছিলই, কিন্তু তার চোখে লাজোকে বাঁচানো সত্বেও একটা লজ্জার ভাবও ছিল। পূরোকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার সেই মুহূর্তটা তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। তবুও মনে হচ্ছিল যে তার চেপে বসা ঋণের বোঝাটা কিছুটা অন্তত: হাল্কা হলো।

আবার পুলিশের গলা শোনা গেল : ওদিকে যারা যাবে সেই হিন্দুরা একদিকে চলে যাও।

পূরো সেই রেশমী জোড় আর লাড্ডু ভরতি পুঁটলিটা লাজোর হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর লাজোকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে খুব আদর করতে করতে কেঁদে ভাসিয়ে দিল। তারপর নিজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে শেষ দেখা বুঝেই তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

'দিদি···!' পূরোর ভাই কেবল এই কথাটাই উচ্চারণ করতে পারলো। তারপর দুহাতে দিদিকে জড়িয়ে ধরল।

'আমার কথাটা শোন। এইসময়··' পূরোর ভাই সাহস করে বলেই ফেলল। পূরো ভাইয়ের কথার তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারলো। পূরোর মনেও একবার দ্বন্দ্ব দেখা দিল ; যদি আমি এই সময় বলে দিই যে আমিও এক হিন্দু স্ত্রী তো আমাকেও এরা অবশ্যই লরিতে বসিয়ে নিয়ে যাবে। আমিও তো ফিরে যেতে পারি, আমিও লাজোর মত···দেশের সহস্র সহস্র মেয়ের মত···'

পূরোর চোখে থেমে থাকা অশ্রুধারা নেমে এলো, ও ধীরে ধীরে ভাইয়ের হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর

ওপাশে দাঁড়ানো রশীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

'লাজো নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে, মনে করো তার মধ্যেই তোমার দিদিও ফিরে যাচ্ছে। আমার পক্ষে এখন এই একটা স্থানই তো রয়ে গেছে।' পূরো ধীর স্বরে নিজের ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলল। সে তখন লরিতে উঠছে।

রামচন্দ্র নতমস্তকে পূরোর সামনে হাত জোড় করল, বুঝি বা হৃদয়ের গভীরের তীক্ষ্ণ কোন যন্ত্রণা উঠে এসে তার ঠোঁট দুটিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিছুই বলতে পারলো না সে।

'যে কোন মেয়ে, সে হিন্দু হোক কি মুসলমান, যে সব মেয়েরা ফিরে গিয়ে আপন আপন ঘরে ঠাঁই পাচ্ছে, মনে করো তাদের সঙ্গে সঙ্গে পূরোর আত্মাও সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে গেছে।' পূরো নিজের মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করল। তারপর চোখ দুটো ওর মাটির দিকে নামিয়ে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শেষ বিদায় জানালো।

লরিগুলো ছেড়ে দিল। খালি সড়ক তখন ধূলায় ধূলায় আচ্ছন্ন।

গল্পগুচ্ছ

পাঁচজন কুমারী

ঠিক পাঁচটা বাজলেই একটা চিল আসতো, ওদের চোখের ওপর ঝাপ্টে পড়তো, তারপর ওদের সামনে পড়ে থাকা পনিরের টুকরোটা নিয়ে চলে যেতো।

ওদের সবার চোখে প্রত্যেকদিন খচখচে জ্বলুনি উঠতো।

'ও এসে গেছে?' একজন বারান্দাতে আসতে আসতেই জোর গলায় জিজ্ঞেস করতো।

'ব্যস, এই এল বলে।' যে বারান্দায় আগেই এসে দাঁড়াতো, সে জবাব দিত আর সেই সঙ্গে 'ইন্' লেখা গেটটার দিকে এমনভাবে তাকাতো যেন চোখ দিয়েই সে গেটটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

তৃতীয় জন চুপচাপ বাইরের সড়কের দিকে এমন ভাবে বারে বারে দেখতো যেন হয়রান হ'য়ে ভাবছে যে কাল রাত্রেই তো স্বপ্নে সে এই সড়কটা ভেঙ্গে ফেলেছিল, অথচ আজ আবার সেটা যেমন ছিল তেমনই···

চতুর্থ জন সড়কের দিকে নয়, সদর দেউড়ির সেই সিঁড়িগুলোর দিকে দেখতে থাকতো, যেখানে কেউ দাঁড়ালে আর কিছু দেখা না যাক, সেরেফ বুটজুতো দেখা যেতোই।

পঞ্চম জন দেহে কিছুটা খাটো, সে দেউড়ির কাছে নীচে দাঁড়ানো কারোর শুধু বুটজুতো নয় উপরন্তু তার প্যান্টের নীচের ভাঁজটুকুও দেখতে পেতো। আর তখন সে পলকের জন্য আকাশের দিকে এমন ভাবে দেখতো যেন কোনও থানাতে কোনো একটা বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করছে··

ঠিক তখন 'ইন্' লেখা গেট দিয়ে একটা মোটর ঢুকতো, দেউড়ির সামনে দাঁড়াতো, না, সেরেফ একটু যেন গতিটা কম বলে মনে হতো, আবার পরক্ষণেই খুব জোরে 'আউট' লেখা গেট দিয়ে বাইরে চলে যেতো।

দোতলা বাড়ীর ওপর তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই সব মেয়েরা এমন চমকে উঠতো একবার যেন ঐ মোটরটা একেবারে ওদের গায়ে লেগে চলে গেল ; আর ওরা একচুল দূরে থাকায় কোনক্রমে বেঁচে গেল।

তারপর ওরা সব শূন্য দেউড়ির দিকে এমনভাবে তাকাতো, যেন এইমাত্র সেখানে একটা দুর্ঘটনা হ'তে হ'তে হলো না।

রোজ নিয়ম করে বিকেল পাঁচটা বাজলেই এরকম হ'তো। একমাত্র রবিবার ছাড়া।

এই পুরো কাহিনীটা যদি প্রাচীন ঢঙে বয়ান করতে হয়, তবে এইভাবে বলা যেতে পারে—একটা অফিস ছিল, তার এক মালিক ছিল, আর সেই মালিকের ছিল পাঁচজন স্টেনো…

অফিসটা বেশ বড় ছিল, বেশ কয়েকটা সেক্‌শানে ভাগ করা ছিল, আর প্রত্যেক সেক্‌শানের ছিল একজন করে বস্‌, কিন্তু আন-অফিসিয়ালি বললে বলতে হয়—সেক্‌শান ছিল ঐ একটাই, বসছিল ওই একজনই।

ও যেদিক দিয়ে চলে যেতো, বাতাসে সুগন্ধ ছড়িয়ে যেতো। স্টাফ-রুমের টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠতো আরও যে স্টেনো মেয়েটিকে নিজের কামরায় কাজের জন্য ডেকে পাঠাতো, সেই মেয়ের বুকটা ধড়াস করে উঠতো!

ফাইল যে কোন বিষয়ে হোক, কিন্তু সব ফাইলের ওপরেই যেন দৈবঅক্ষরে 'আর্জেণ্ট' লেখা থাকতো। হুকুম বসের ঠোঁটের ডগায় আসতে না আসতেই মেয়েদের হাতে নিষ্পন্ন হয়ে যেতো তৎক্ষণাৎ।

বসের আন্‌অফিসিয়াল নাম ছিল 'বাদশাহ-সালামত'। আর পাঁচজন স্টেনো মেয়ের কাছে ওনার নামের সঙ্কেত-লিপি ছিল 'কোর্ট-ড্যান্সার্স।'

আর যেমন কোর্ট-ড্যান্সার্সদের নিপুনতায় কেবল ওদের কুশলতাই সব নয়, ওদের বেশ-ভূষা ওদের চলাফেরারও একটা গুরুত্ব থাকে, প্রতিটি স্টেনো মেয়ে অফিসে আসার সময় তেমনি নিপুন, সতর্ক

হয়ে আসে। তাদের ওঠা, বসা, চলা অন্যদের কাছে উদাহরণের মত। তারপর বসের ডাক পড়লে, যে মেয়েকে কামরায় যেতে হবে, সে একবার অন্ততঃ তার ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে রাখা ছোট্ট আয়নাটা বার করে গভীরতর মনোযোগে নিজেকে দেখবেই। যেমন নিজের ফাইলগুলো দেখে!

বসের যে সব কাগজে দস্তখত করার কথা, করতো। এরপর কি কি কাজ করতে হবে সব বলে দিতো, তারপর আবার ফাইলটা সেই মেয়ের হাতেই দিয়ে দিতো, সেই ফাঁকেই নিপুন কাজের জন্য পলকের জন্যে মুখ তুলে বলতো 'গুড!' তো সেই মেয়ের মনে হ'তো দিনটা আজ তার সার্থক!

কোনও মেয়ের চাকুরী পাঁচ বছর, কারও ছয় বা সাত বছর হয়ে গেছে। অফিসের বিরুদ্ধে মেয়েদেরও কোন অভিযোগ নেই, অফিসের তরফেও মেয়েদের প্রতি কোন অভিয়োগ নেই। মেয়েদের কেবল একটাই নিঃশব্দ বা সোচ্চার দাবী ছিল এই যে তাদের যেন এই সেক্‌শান থেকে বদলী করা না হয়।

বসের মাথার কালো চুলের রাশিতে এই বছরই এক গুচ্ছ সাদা চুলের রেখা দেখা গেল। কিন্তু মেয়েদের ভাষায় ওটা 'গ্রেস্'—সৌন্দর্য্য। নচেৎ তাঁর নামের বিশেষণগুলো আগের মতই কায়েম রয়ে গেছে—রোমান-ফীগার, গ্রীক-বিউটি, ইটারন্যাল ইউথ, এঞ্জেল ফেস্, লিভিং গড! (রোমানদের মত শরীর, গ্রীকদের মত সুন্দর, শাশ্বত যৌবন, দেবদূতের মত মুখ, জীবন্ত ঈশ্বর!) সে এক স্বপ্নের মত ছিল, যে ঘণ্টা সাতেক মেয়েদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকতো (লাঞ্চের সময়টুকুও প্রায়ই তাতে যুক্ত হতো, কেন না বাড়তি কাজটুকু মেয়েরা এই সময়ই করতো।) তারপর যখন ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার কাছাকাছি এসে পড়তো তো এই স্বপ্নটা ভেঙ্গে যাবার সময় হতো…

ঠিক পাঁচটা বাজলে, বসের স্ত্রী মোটরে চেপে আসতো, আর বসকে মোটরে বসিয়ে নিয়ে যেতো। আর মোটরের কালো রঙটা মেয়েদের কাছে চিলের ডানার মত মনে হতো…

প্রথম প্রথম মেয়েরা সেরেফ মোটরের রঙটাকেই চিলের ডানার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল ; কিন্তু পরে ওদের এই কথাটা 'ফল্‌স্‌ কালচার' বা মিথ্যে ভান বলে মনে হতে ওরা পরস্পর কথা বলার সময় সোজাসুজি ব্যাপারটাকে বসের বউয়ের সঙ্গে জুড়ে দিল।

বউ ঠিক পাঁচটা বাজলেই একটা চিলের মত হাজির হতো, মেয়েদের চোখের ওপর ডানা ঝাপটাতো, আর ওদের সমস্ত দিনের পরিশ্রমে উপার্জিত ওদের 'হক', ন্যায্য পাওনা, ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে···

ওদের এই 'হক'-কে ওরা প্রথম দিকে একটা পনীরের টুকরোর মত মনে করতো। কিন্তু একদিন মেয়েদেরই একজন এটাকে 'ভেজিটারিয়ান টাক্‌' বা নিরামিষ বিশেষণ বলে উল্লেখ করতে সবাই মিলে এটাকে একটুকরো-মাংস বলতে লাগল। কিন্তু হাসি মস্করা করার ফাঁকেও কোন মেয়ে একে অপরের কাছে একথা কখনও প্রকাশ করেনি যে বস্‌-এর স্ত্রীকে চিল আর বস্‌-কে মাংসের টুকরো কল্পনা করতেই, প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে একটা উত্তেজনা, একটা উষ্ণ-স্রোত তোলপাড় করে দিতো···

রোজ বিকেল পাঁচটা বাজলেই স্বপ্নটা ভেঙ্গে যেতো। আর মেয়েরা যখন নিজের নিজের বাড়ী ফেরার জন্য বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াতো, ওদের হঠাৎই নিজেদেরকে বড্ড ক্লান্ত মনে হতো। কিন্তু এই স্বপ্নটাও বুঝি সূর্যের মত। রোজ বিকেলে অস্ত যেতো, রোজ সকালে আবার উদয় হতো। আর মেয়েরা যখন সকাল সাড়ে ন'টা বাজলেই নিজের নিজের বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াতো, তো ওদের আপনা থেকেই নিজেদেরকে বেশ সজাগ, সতেজ বলে মনে হতো।

জীবনের এই প্যাটার্ণ বা ছন্দ বিশদ বলা বা না বললেও মেয়েরা তো কবুল করেই নিয়েছে বলে যখন ভাবতে আরম্ভ করেছিল, তখনই আচম্‌কা সব গোলমাল হয়ে গেল। বস্‌-এর বিবি মরে গেল। মেয়েরা খবর শুনলো, একে অপরকে শোনালো, ফের একে অন্যকে

জিজ্ঞেস করলো। যেন ওরা বলে বলে আর জিজ্ঞেস করে করে এই খবরের সত্যতা যাচাই করে নিতে চাইছিলো।

. খ্রী গত এক সপ্তাহ ধরে বস্-কে নেবার জন্য আর আসছিল না। খবর ছিল যে অসুস্থ। কিন্তু মেয়েরা রোজ পাঁচটা বাজলেই বাইরের সড়কের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকতো যেন আজও সে এসে গেছে, ব্যস এলো বলে। এবার তো মৃত্যুর খবর পেয়ে গেলো ওরা, কিন্তু ওদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না। ওরা, তখনও পাঁচটা বাজলেই শূন্য সড়কের দিকে তাকিয়ে দেখতো, আর ওদের মনে হতো, সে এক্ষুণি চলে আসবে, ব্যস এসে গেছে।

কিন্তু আরও কিছুদিন যখন চলে গেল তো মেয়েদের মনে বিশ্বাসের একটা ক্ষীণ বিন্দু জেগে উঠলো যে সে বোধহয় সত্যি সত্যিই মরে গেছে। বসের মোটরটা এখন সারাদিন নীচে এক কোনে দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচটা বাজলে ও কামরা থেকে বেরিয়ে আসতো, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতো, কিন্তু নীচের দেউড়িতে আর দাঁড়াতো না। বাইরে এক কোনে দাঁড়ানো মোটরের দরজা খুলতো তারপর চলে যেতো।

মেয়েরা তখনও রোজ ঠিক পাঁচটা বাজলেই বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতো, চুপচাপ যেন বিদায় নিচ্ছে, এমন ভাবে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতো আর বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে চলে যেতো। কিন্তু, কতবছর ধরে গড়ে ওঠা জীবনের এই ছন্দ, প্যাটার্ণ, যা বাইরে থেকে এখনও আগের মতই মনে হয়, ভেতরে বুঝি ভেঙ্গেই গিয়েছিলো…

'রোজ চিলের মত উড়ে চলে আসতো তো, বোধ হয় আমাদের দীর্ঘশ্বাসের ছোঁয়াচ লেগেছে।' এই মজাটা যেন কিছুদিন ধরে চলতে চলতে, আপনা হ'তেই শেষ হয়ে গেল।

তারপর মেয়েদের একজন যদি বস-এর কামরায় ফাইল নিয়ে যাতায়াত করলো, তো বাকী চারজন তার দিকে এমনভাবে তাকাতো যেন আজ বাকী চারজনের সঙ্গে ধোঁকাবাজী করবেই করবে।

কোন মেয়ে যতক্ষণ সময় বস্-এর কামরায় থাকতো, বাকী

চারজন মেয়েরও মনে হতো সেই সময়টা যেন আর কাটতেই চাইছে না।

তারপর যখন কোন মেয়ে বস্‌-এর কামরা থেকে ফিরে আসতো, তো বাকী চারজনই তার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাতো যেন ওরা তাকে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করতে চাইছে।

তারপর পাঁচজনই যখন সকালবেলা অফিসে আসতো, একজন অন্যজনের দিকে দেখতো, তখন প্রত্যেকেই 'দ্বিতীয়' জনকে ভাবতো যে আজ 'ও' খুবই স্মার্টলি সেজেগুজে এসেছে তো।

'এই শাড়ীটা তুমি কবে কিনেছিলে?'

তোমার এই পার্সটা তো আগে কোনদিন দেখিনি?'

'তোর এই ব্লাউজটাতে মেরে কেটে আধ-মিটার কাপড় লেগেছে বোধ হয়। পিঠের দিকে তো কাপড়ই নেই, সেরেফ একটা হুকের মত রয়েছে কেবল...'

ওরা আগের চেয়েও বেশী করে পরস্পরের তারিফ করে, কখনও কারো নতুন পার্সের কখনও কারো নতুন স্টাইলে চুল কাটানো দেখে, কিন্তু প্রতিটি আপাত-মিষ্টি শব্দের সঙ্গে একরকমের কটুতার মিশ্রন থাকতোই।—

'ডোণ্ট ওয়ারি, আই ওণ্ট হুক্ হিম,' (ঘাবড়ে যাস না। আমি ওকে গাঁথবার চেষ্টা করব না।) কখনও কেউ তেরছা জবাব দিয়ে দিতো। যার ব্লাউজের নতুন কাট্ দেখে মন্তব্য করা হ'লো, হয়তো সেই। ব্লাউজের 'হুক্' আর বস্‌-কে 'হুক্' করা, (গেঁথে তোলা!) কথা দুটো বেশ সমান্তরাল হয়ে স্বভাবতই মিলে যেতো।

'ডোণ্ট বী অ্যাংরী ডিয়ার ডেভিল,' (রাগ করিস না দুষ্টু সোনা! দ্বিতীয়জন হয়তো হেসে উড়িয়ে দিতে চাইত বা নির্দোষ ভঙ্গীতে খোঁচা মেরে বিদ্রুপ করে উঠতো,—হায়! মরে যাই তোর ভাল-মানুষির পায়ে!

পরিবেশ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। ধোঁয়াটে লাগতো কখনও কখনও, তবে ভেতর ভেতর। বাইরের দিকে কিন্তু আগের চেয়েও

অনেক চটকদার হয়ে উঠেছিল।

মেয়েদের সব ঝক্‌ঝকে্‌ লাগছিল,—পোষাকে পারিপাট্যে তো বটেই, উপস্থিতির দিক থেকেও। কাজ তো একরকমভাবে ওরা আগেও করতো, কিন্তু এখন হঠাৎ কাজের আগ্রহ ওদের যেন পেয়ে বসলো। আগে তো ওরা কাজ করতো বসকে খুশী করার জন্য, এখন একে অপরকে নীচু বা হেয় করার জন্য যেন ওরা কাজ করতে লাগল।'

কিন্তু এইভাবে মাত্র মাস ছয়েকই চললো।

তারপর উত্তপ্ত সেই পরিবেশের ওপর কুয়াশা পড়ে গেল। শোনা গেল, বস্‌ একজন ইংরেজ তরুণীকে বিয়ে করে ফেলেছেন।

মেয়েদের হাতে ধরা ফাইলগুলো হঠাৎ কেঁপে উঠলো আর ফাইলগুলোর লাল, সবুজ আর হলদে রঙ টেবিলের ওপর কালো কালির মতো ছড়িয়ে পড়লো।

সেইদিন বিকেলে ঠিক পাঁচটা বাজতেই শূন্য সড়ক ধরে একটা গাড়ী এল, গেটের সামনের লনে এসে দাঁড়ালো, সোনালী রঙের চুল মাথায় এক তরুণী গাড়ী থেকে নামলো, সে বস্‌-এর হাত নিজের হাতে ধরলো, তারপর গাড়ীতে বসে ফের চালিয়ে চলে গেল।

'দিস্ টাইম ইট্‌ ইজ্‌ এ ফরেন কালচার,'— (এবার দেখছি বিদেশী পীরিত!) একজন মেয়ে ধীর স্বরে বলল, কিন্তু কেউই হুঁ হা কিছু বলল না। সকলেরই মনে হচ্ছিল যে আজ হুঙ্কার দেবার মত সাহসই ওদের নেই।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নামা, আর বাইরের বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে যাওয়া। যেতে যেতে, আজ সবকটি মেয়েরই মনে হচ্ছিলো যে ওরা সবাই বুড়ি হয়ে গেছে!

দুটি মুহূর্তের খোঁজে

'মনে হচ্ছে আমরা এখনও মরে যাই নি!' মীনুর গলার স্বর শান্ত তো ছিলই আর কোমলও ছিল। কিন্তু নিস্তব্ধতার অতল থেকে এমনভাবে সেই স্বর ভেসে এল যে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্ খান্ হ'য়ে গেল।

সবার প্রথম যে সীট ছেড়ে উঠলো, সে খুব মনোযোগের সঙ্গে নিজের সীট নম্বরটা দেখে নিল—ডি-তিন। তারপর আগের সীটে যে একজন ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার সীট নম্বর?' তারপরই ফের বলল, 'যাই হোক, মনে করে রাখুন, ওই সীট নম্বর আসলে আমাদের কবরের নম্বর, সবাই নিজের নিজের কবরের নম্বর দেখে রাখুন, ফিরে এসে আবার আমরা নিজের নিজের কবর খুঁজে নেবো, কিন্তু এই মুহূর্তে, আমরা সত্যি সত্যিই বেঁচে আছি। আর, এখন আমরা বাইরে বরফের ওপর গিয়ে বরফের দৃশ্যাবলী দেখতে পারি।'

অন্য আর একজনও সীট থেকে উঠে পড়ে বলল, 'কেবল দৃশ্যাবলীই দেখবো? কারো কাছে ক্যামেরা আছে নিশ্চয়ই, দৃশ্যাবলীর ছবিও তুলে নেওয়া যায়।'

আবার আরেকজন সীট থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'মৃত্যুর দূত-মশাই এসে তো হদিসই করতে পারবেন না যে আমরা কোথা থেকে আসছি; কাছে যদি ছবি থাকে, তাহলে সঠিক অবস্থান বলে দেওয়া যাবে।'

মীনুর পেছনের একটা সীটে এক গ্রাম্য মেয়ে একেবারে জড়োসড়ো হ'য়ে বসেছিলো। মীনু নিজের সীট ছেড়ে উঠে সেই মেয়েটিকেও উড়োজাহাজের বাইরে চলে আসতে বলল।

মেয়েটির মুখের হলদে হয়ে যাওয়া রঙ মুছে গিয়ে এখন একটা সবুজাভা দেখা দিল। সে বড় বড় চোখ করে মীনুর মুখের

দিকে তাকালো। তারপর মাথা নেড়ে 'না' করে দিল।

মেয়েটির গলায় একটা সোয়েটারই কেবল বাঁধা। মীনুর মনে হলো ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাতেও বোধহয় কাঁপছে মেয়েটি। মীনু কিছুই বললো না। একটা কম্বল নিয়ে সেই মেয়েটির কাঁধের ওপর ফেলে দিল।

'সো ইয়াং ম্যান। য়ু আর এ স্পেস এক্সপ্লোরার! কোনও একজন বয়স্ক লোক বললেন, একবার চারপাশে অন্তহীন বরফের দিকে দেখলেন, তারপর তার কাঁধে মিনিটখানেক হাত রাখলেন যে সকলের আগে নিজের সীট ছেড়ে উঠে বলেছিলো যে এখন আমরা বাইরে গিয়ে বরফের দৃশ্যাবলী দেখতে পারি।'

জবাবে সেই দ্বিতীয় লোকটি, বয়স্ক ব্যক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু কিছু বলল না।

হাওয়াতে জোর ছিল না, কিন্তু সেই মৃদু মন্দ হাওয়াতেও বরফের কণা মিশেছিলো। পায়ের নীচের বরফ শুকনো কাঠের মত চড়্‌চড়্‌ করে শব্দ করছিলো। বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে সেই লোকটিও যেন আশপাশের সমস্ত বরফ নিজের চোখের মধ্যে ধরে রেখে বলে উঠলো, 'এও সেই শুকনো কাঠেরই কফিন, আমাদের সকলের কফিন। নাও, ভালো করে সবাই দেখে নাও কফিনটা!'

যে এই বিস্তৃত বরফকে দৃশ্য বলে বর্ণনা করেছিলো, সে চুপচাপই ছিল। কেমন যেন বয়স্ক লোকটার প্রতি তার একটা বিরক্তিবোধ জেগে উঠছিলো।

দুজনের দিকেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল মীনু। কিন্তু ওর কানে তাদের কথাবার্তা সবই ভেসে এলো। ও আস্তে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তো বেঁচে আছি, এবং এখন আমরা কফিনের ওপর দিয়েই চলে বেড়াচ্ছি।'

'তোমার এই কথার জন্যই আমি তোমাকে স্পেস এক্সপ্লোরার বলেছিলাম। বলো, ভুল বলেছিলাম কিছু?' বয়স্ক দেখতে লোকটা ফের বলল। তার স্বরে এখন বিরক্তি নেই, কেবল ক্লান্ত বলে মনে

হচ্ছিলো।

'একথা তো প্রথমে আপনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেন নি, তাহলে তো আমি সেটা প্রশংসা বলেই মনে করতাম।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীনুর হাসি পেয়ে গেল।

'আচ্ছা ম্যাডাম', বয়স্ক দেখতে সেই লোকটার পা নয়, যেন গলার আওয়াজ বরফের মধ্যে বসে যাচ্ছে, এমন স্বরে সে বলতে লাগল : 'প্রথমে না হোক এবারে এটা প্রশংসা বলে মেনে নাও।' যদি তোমাদের মত সমর্থ জোয়ানরাই মৃত্যুর সঙ্গে ঠাট্টা না করবে তো আর কারা করবে।'

কথার সুরু যার সঙ্গে, সে এখনও চুপচাপ। কেবল মীনুর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলল। মুখে বলল না কিছু। শুধু নিজের পায়ের নীচে আর মীনুর পায়েব নীচে বরফ ভাঙ্গা কিচকিচ শব্দ শুনতে লাগল।

ওরা চুপচাপ ছিল, কিন্তু বরফ, বরফের উদ্দেশ্যে যেন কিছু বলছে বলে মনে হচ্ছিলো।

বরফ যতদূর বিস্তৃত ছিলো, একই রকম দেখাচ্ছিল, কিন্তু জাহাজের আরোহীদের রঙে ঢঙে পার্থক্য ছিলই। ধবধবে গোরা রঙের আরোহী একাকী আলাদা এক গ্রুপে রয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্তান-বাসী বলে যাকে মনে হচ্ছে সেও আলাদা গ্রুপে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন, কয়েক মিনিটের জন্য বিমানের দিকে গেল, ফিরে এলো তো তার সঙ্গে দেখা গেল এয়ার-হোস্টেসকে। তার হাতের ট্রে-তে কয়েকটা গ্লাস।

'বন্ধুগণ! এই শেষ আমন্ত্রণ…' কথাগুলো যে বলল তার গলা থেকে শব্দগুলো যেন হাতে ধরা গেলাসের জলের মত চলকে পড়লো।

'আসুন আমরা পরিচয় পর্বটা সেরে নিই!' যে কথাগুলো বলল তাকে দক্ষিণ ভারতের বলে মনে হলো।

'একবার করে নিজেদের মুখ থেকেই নামগুলো শুনে নেওয়া যাক…' অন্য আরেকজন কথাগুলো বলে নিজের নামটাও ঘোষণা

করল : আমার নাম জে. সি. পুরী।'

'মাই নেম ইজ ডক্টর রাও।'

'আমার নাম বলদেব শর্মা।'

প্রবীন দেখতে ব্যক্তি বললেন, 'এই দাসকে বলবন্ত সিং বরাড় নামে ডাকা হয়, কিন্তু এই ফাঁকি বাজির দুনিয়ায় সব নামই মিথ্যে। এক পরমাত্মার নামই সত্য, বাকী সবই মিথ্যা।'

'আমার মিথ্যে নাম সুলতান।' কথাটা বলল সে, যে এতক্ষণ মীনুর সঙ্গে সঙ্গে চললেও চুপ করেই ছিল।

'আর আমার নাম মীনু ফাঁকি।' কথাটা মীনু এমন ভাবে বলল যেন ফাঁকি ওর নামের পদবী।

হাসি উঠল, স্বভাবতঃই, হাল্কা বরফ পড়ার মত ঝুরঝুর করে সকলের ঠোঁটের সেই হাসি বরফে ভিজে ভিজে উঠলো।

'আর আমাদের অতিথির নাম?' মিঃ পুরী জিজ্ঞেস করলেন।

'কে. পি. এস. মদান।'

মিঃ মদান প্রথম গেলাসটা বিমান-সেবিকার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'ম্যাডাম! আজ কেউ বিশেষ অতিথি বা অভ্যাগত নয়, আমরা সকলেই মুহূর্ত কয়েকের অতিথি মাত্র। তুমিও এখানে আমাদের কাছেই এসে বসো!'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি এখনও ডিউটিতেই আছি। পাইলট দুজন ইঞ্জিনের কাছে রয়েছে। এখনই হয়তো আমাকে দরকার পড়ে যাবে ওদের...' বিমান সেবিকার গলার স্বর স্বাভাবিকই ছিল। তবু কারো কারো মনে হলো যেন একটা আশা-হীন সুর জেগে উঠল সেই স্বরে। বুঝি বা পাইলট দুজন যখন আরও হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে, হেরে যাবে আমি আর কোন কাজে লাগবনা যখন তাদের, তখন আমি এখানে বরফের মধ্যে শেষ শয্যা নেবার জন্য তোমাদের কাছেই তো ফিরে আসবো! অবশ্য, কারো আবার মনে হলো সেই স্বরে কিছুটা আশার স্পন্দনই তারা অনুভব করেছে, 'দাঁড়ান! এখনই বসে পড়া নয়, ইঞ্জিনের একটু খোঁজ খবর

করে আসি।'

'ম্যাডাম। একবার অন্ততঃ সত্যি সত্যি বলুন, ইঞ্জিন ঠিক হয়ে যাবার সামান্য আশাও কি আমরা করতে পারি?' মিঃ বরাড় দ্রুত স্বরে কথাগুলো বলে উঠলেন। তার গলার স্বর সামান্য কেঁপে গেলো! নৈরাশ্য ভরা এই কথা গুলো যেন নিঃশব্দে বরফের বুকের মধ্যে গেড়ে বসে যেতে লাগল।

'ইঞ্জিন হয় তো নয়, তবে হয়তো রেডিও···যেখানে হোক, কোন জায়গায় যদি খবর দিয়ে দেওয়া যায়···' বিমান সেবিকা হাতের ট্রে টা উঁচু একটা বরফের চাইয়ে রেখে দিয়েছিল। তাই কথাগুলো বলে ফিরে চলে গেল।

মিঃ মদান অন্য একটা গ্লাস তুলে মীনুর হাতে দিল। মীনু 'না' করলো না। হাতে নিলো গ্লাসটা। তারপর শুধু বলল: শ্যাম্পেন-ফ্লাইটের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু শ্যাম্পেন্-ল্যাণ্ডিং-এর কথা শুনিনি। মিঃ মদান, আপনি এয়ার ইণ্ডিয়া সার্ভিসকে একটা নতুন বাক্য উপহার দিলেন।'

সকলের দৃষ্টিই একপলের জন্য মীনুর মুখের ওপর এসে আটকে গেল যেন। তাদের দৃষ্টির ভাষা বোধহয় একই রকম—আহা! আজকের আমন্ত্রণে যদি মৃত্যু তার পক্ষচ্ছায়া বিস্তার না করতো! সকলেই হাতে হাতে গ্লাস তুলে নেবার পর মিঃ মদান বলল: 'মিঃ সিংহ ঠিকই বলেছিলেন' আই মিন মিঃ বরাড়···যে এই মিথ্যে দুনিয়ায় সব নামই মিথ্যে, কেবল এক পরমাত্মার নামই সত্য। সুতরাং আজকের এই অন্তিম পানীয় আমরা সত্য-পরমাত্মার নামেই পান করি আসুন!'

মিঃ বরাড়ই প্রথম নিজের হাতের গ্লাস উর্ধে তুলে ধরলেন। তারপর সবাই।

কেবল সুলতান ধীর স্বরে মীনুকে বলল: 'শুধু আজকের শরাবই নয়, খাবার জলের প্রতিটি ঢোঁক, আর গলা অবদি উঠে আসা অন্তিম নিঃশ্বাস, সবই এই মিথ্যে দুনিয়ার নামে···।'

মিস্টার মদান তো একই ঢোঁকে গেলাসের প্রায় সবটুকু পানীয় শেষ করে দিলো, কিন্তু বাকী সকলেই শেষ গ্লাস একটু ধীরে ধীরে, চেখে চেখে আস্বাদ নিতে চাইছিল।

'এই শেষ গেলাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দানা পানিও শেষ হয়ে যাবে।' মিঃ বরাড় নিজের হাতে ধরা গ্লাসের দিকে তাকালেন, ছোট একটু চুমুক দিলেন, চকিতে মাথার মধ্যে সেই চিন্তাটা পাক খেয়ে উঠলো, এই যদি শেষ পানীয়ের গ্লাস হয় জীবনে, কপালে যদি এটুকুই লেখা হয়েছিল, তো তাহলে সে যত ধীরে ধীরে পান করবে, ততই তার বেঁচে থাকার সময় হয়তো সেই ক্ষণটুকু পর্য্যন্ত বাঁধা হয়ে থাকবে।

'বন্ধুগণ! দুঃখ করো না। পকেটে যত বিদেশী টাকা ছিল, সবই খরচ করে ফেলেছি। অন্তিম নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পান করে যাও!' মিস্টার মদান কথাগুলো বলে অভারকোটের পকেট থেকে আরও একটা বোতল বার করলেন।

সুলতান আর মীনু কিছুটা পিছিয়ে এসে বরফের একটা বড় চাঁইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মিস্টার মদান ওদের গেলাসে আরও কিছু পানীয় ঢেলে দিতে চাইলেন, কিন্তু মীনু 'না' করে দিল, 'আমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।'

মীনু ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো বরফের রাশি থেকে এক মুঠো করে তুলে নেয় আর গেলাসের মধ্যে ফেলে দেয়। খালি হয়ে আসা গেলাস আবার ভরা ভরা লাগে।

সুলতান চুপচাপই ছিল। শুধু একবার মীনু যখন ফের এক মুঠো বরফ তুলে গেলাসে দিল, তো সুলতান বলল, 'মিস্টার সিংহ এই বরফকে আমাদের কফিন বলেছেন…'

'সে জন্যেই সমস্ত বরফ আমি খেয়ে ফেলতে চাই—সো আই ওয়াণ্ট টু ড্রিঙ্ক দ্য হোল্ লট…' মীনু খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। তারপর দূরে, কাছে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, বরফের বিস্তৃত ভূমির দিকে তাকিয়ে রইলো।

মীনুর পরনে সাদা রঙের নরম কোট। কিন্তু সুলতানের পরনে কালো কোট। পেঁজা তুলোর মত সাদা বরফ মীনুর কোটের ওপরও পড়ছিল, কিন্তু স্বভাবতই আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল না, যতটা সুলতানের কালো কোটের ওপর দৃশ্যমান ছিল।

'জীবন এক আজব বস্তু।' সুলতান এমন স্তিমিত স্বরে বলল, যেন মীনুকে নয়, নিজেই নিজেকে শুনিয়ে বলছে।

'হ্যাঁ, সত্যিই আজব বস্তু!' মীনুর কথাগুলোও যেন হাল্কা, পেঁজা তুলোর মত ঝুরঝুর ঝরে পড়লো ওরই পায়ের কাছে, আশে-পাশে।

সুলতান কতক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কালো কোটের ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ঝেড়ে ফেললো।

'আমরা পরস্পরকে আগে কখনও দেখিনি, অথচ আমরা মরবো একই সঙ্গে—উই নেভার মেট ইন লাইফ, বাট উই উইল ডাই টুগেদার!' সুলতান বলল। যেন এই কথাগুলোকেও সে বরফের মত ঝেড়ে ফেলে দিল।

'একাকী, না একই সঙ্গে, তাতে কিছুই যায় আসে না···। 'মীনু কথাগুলো বলে এবারে ঝুঁকে পড়ে মাটির ওপর থেকে বরফ না তুলে কোটের কলারের ওপর জমে থাকা বরফগুলো আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে জড়ো করে গেলাসের মধ্যে ফেলে দিল।

'এইখানেই বোধহয় কোটের কালো রঙ আর সাদা রঙের তফাৎ ' সুলতান হেসে ফেলল যেন।

'তার মানে?' মীনু জিজ্ঞেস করল।

'মৃত্যুর চেহারাও বোধহয় সাদা বরফের মতই। সাদা কোটের ওপর নজরই পড়ে না, কিন্তু কালো কোটের ওপর চট্ করে নজরে পড়ে যায়।'

এইবার মীনুও হেসে ফেললো। বলতে লাগল, 'সুলতান! এজন্যেই বুঝি জীবনকে আজব, অদ্ভুত বলেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, তুমি নিজেও তো বলেছিলে যে জীবন এক আজব বস্তু?'

'আমি সে জন্য বলি নি। অন্য কথার সূত্রে বলেছিলাম।'

'কোন্ কথার সূত্রে?'

'যে মুহূর্তে কেবিনে ঘোষণা করা হলো যে একটা ইঞ্জিনে সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছে, বাঁ দিকের সামনের সারির সিটগুলোতে যারা বসে আছেন তারা ডান দিকে চলে আসুন, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝে গেছলাম যে বাঁদিকের ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে…'

'মাই গড। সেই মুহূর্তেই তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরে গেছলাম যে আজই শেষ দিন; তবুও মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। অবশ্য এমন আশা করিনি যে তার পূরণ হবেই; কিন্তু হয়ে গেল, সেজন্যেই জীবনটাকে বলছিলাম আজব বস্তু!'

সুলতান মীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বুঝি বা কবরে পা রাখবার মুহূর্তে ইচ্ছা-পূরণের এই সব কথা তার কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল।

'খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে, তাই না?' মীনু প্রশ্নের ভঙ্গীতে বললেও উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফের বলতে লাগল, 'বিমানে আগুন লেগে যাবে আর আমরা আলমারীতে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো জ্বলে পুড়ে মরে যাবো—নাহ্। আমার ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয়েছিল। সেই মুহূর্তে আমার একমাত্র আকাঙ্খা ছিল, আহা! যদি আমাদের পাইলট কোন উপায়ে বিমানটিকে কোন জঙ্গলের মধ্যে বা বরফ-আচ্ছাদিত কোনও স্থানে নামিয়ে নিতে পারে, আর আমরা জঙ্গলের স্বাধীন জানোয়ারদের মত স্বভাবতঃই মৃত্যুর মুখোমুখি হ'তে পারি…'

কয়েক মিনিট সুলতান কোন কথা বলতে পারলো না। কিছুক্ষণ পর মীনুই আবার বলল, 'আমি জীবনে কারো প্রতি ততটা কৃতজ্ঞ হইনি, যতটা আজ হয়েছি আমাদের পাইলটের প্রতি…'

বলতে বলতেই মীনু দূরের বিস্তৃত বরফঢাকা ভূমির দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলো যেন এই চেনা পৃথিবীর এমন রূপসী মূর্তি

জীবনে এই প্রথমবার দেখছে সে।

সুলতানের মনে হলো যে মীনুর চোখে সে যেন দেখতে পেল, এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা আর আঁধারের খেলা একই সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হলো তার—আগে কখনও মৃত্যুকে স্বাগত জানাবার এমন প্রবল আকাঙ্খা জাগেনি, এমনভাবে আগে কখনও বেঁচে থাকার দুর্নিবার স্পৃহাও বুকের মধ্যে আকুলিবিকুলি করে ওঠে নি···

নৈঃশব্দ ওদের শরীরকে ঘিরে বরফের মতই ঝরে পড়তে লাগল···

ওদের সামনে বাকী যারা ছিল, অনেক পান করেছিল তারা এরমধ্যেই।

'আসুন! একটা গেম খেলা যাক।' মিস্টার মদান বলছিলেন আর জিজ্ঞেস করছিলেন, 'প্রত্যেকে একেকবার সেই সব মেয়েদের নাম বলতে থাকুন, যাদের সঙ্গে তারা রাতের পর রাত কাটিয়েছেন!'

'এখন ওইসব মেয়েদের টেনে এনে কি নরকে যাবার সঙ্গিনী বানাবো? আমার এখন ভাবতেই দুঃখ হচ্ছে যে যদি বুঝতে পারতাম এ অবস্থায় পড়বো, তাহলে দশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স করে তবে বিমানে উঠে বসতাম। আমার অবর্তমানে ছেলেপুলেরা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতো!' উত্তর দিতে গিয়ে মিস্টার সিংহের গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

'যদি বুঝতেও পারতেন, মিস্টার সিংহ, তবুও আপনি বিমানে চড়ে বসতেনই! স্যার! দশ লাখ টাকা থাকলেও মরে যাওয়া যায় না।' মিঃ পুরী মিস্টার সিংহকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন আবার তার কথা শুনে হাসছিলেন। বললেন, 'আজকের এই মুহূর্ত সত্যকে স্বীকার করার মুহূর্ত, সর্দারজী! এই মুহূর্তে সত্য সত্য বলুন। সমস্ত সর্দারনীদের নামগুলো গুনে গুনে বলে দিন! ছেলেপুলেদের কান্না-কাটির কথা ভুলে যান এখন।'

'আরে, সর্দারনী কত এলো কত চলে গেল! আমি কি খাজাঞ্চিদের মতো খেরো-খাতায় তাদের নামগুলো খোড়াই লিখে

রেখে দিয়েছি।' বলতে বলতে মিস্টার সিংহ মিঃ পুরীর কাঁধে ঠাট্টা করেই বেশ জোরে চাপড় দিলেন।

'বাহরে বাহ্‌, সর্দারজী! এতক্ষণ তো ইনসিওরেন্সের জন্য দুঃখ করছিলেন, এখন আবার সর্দারনীদের খেরোখাতাটাও ছিঁড়ে ফেলে দিলেন···' বলে মিঃ পুরী হাতে ধরা খালি গেলাসটাই মিস্টার সিংহের হাতের খালি গেলাসের সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে দিলেন।

'ভাই, আমি বাস্তববাদী লোক। বুঝতে পারলে তো সর্দারনীর নামে মোটা রকমের ইনসিওরেন্স পলিসি করে তাকেই বিমানে চড়িয়ে দিতাম···' মিস্টার সিংহ খালি গেলাসেই বেখেয়ালে একটা চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন। কিন্তু তখন আর বোধহয় তার কথার দিকে মিঃ শর্মার কোন মনোযোগ ছিল না। সেই খেলার কথাটাই ভাবতে ভাবতে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'খেলাটা তো বেশ জমেছে, কিন্তু সকলেরই ওই নামগুলোও তো বলা দরকার···' মিঃ শর্মা আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না, তার গলার স্বরও হঠাৎ দপ্‌ করে নিভে গেল যেন।

'আপনি কোন্‌ সব নামের কথা বলছেন, পণ্ডিতজী?' মিস্টার মদান মিঃ শর্মার কাঁধে হাত রেখে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে কিছুটা চেষ্টা করছিলেন যেন।

'ওই সব, যাদের দেখে দেখে···' মিঃ শর্মার গলার স্বর আবার নড়বড়ে হয়ে গেল।

'সাবাশ! এই যে বাহাদুর! তুমি বোধহয় সুন্দরী মেয়েদের দেখে দেখে কেবল কল্পনাই করে গেছো। আসলে করতে পারোনি কিছুই—' মিঃ পুরী তার খালি গেলাস মিঃ শর্মার খালি গেলাসের সঙ্গে ঠং করে লাগিয়েই হেসে উঠলেন।

'শোন, শোন নবাবচন্দরগণ! আজ আমি মদ্যপান করিনি মোটেই। আমি কেবল এই প্রথমবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি—এই বার আমি ভেবেছিলাম যে বিলেত গিয়েও নিশ্চয়ই···' মিঃ শর্মার কথাগুলো আবার জড়িয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল।

'বলেন কি পণ্ডিতজী? এ জন্যেই আমাদের বিমান মাঝপথে বিগড়ে গেল না তো—' মিঃ মদান কথাকটা বলেই মিঃ শর্মার কাঁধ ধরে এমন ভাবে ঝাঁকুনী দিলেন, যেন বিমান দুর্ঘটনার আসল কারণটা তিনি হঠাৎই জেনে ফেলেছেন। তার গলার স্বরে করুণ দুঃখের রাগিনী বেজে উঠল: 'হায়রে হতভাগা! তুই তো আমাদেরও ডুবিয়ে দিলি নিজের সঙ্গে…'

'ছেড়ে দিন মশায়, আমরা খেলি আসুন!' ডক্টর রাও রাও মিঃ শর্মার কাঁধ থেকে মিস্টার মদানের হাত টেনে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের দিকে নিয়ে এলেন।

অস্তসূর্যের শেষ রশ্মি মিস্টার মদানের আঙুলের আংটির হীরেটার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'আই অ্যাম্ সরি ফর দিস ডায়মণ্ড রিঙ—' মিঃ রাও আফশোষের স্বরে বললেন, 'অ্যাণ্ড ফর দ্য হ্যাণ্ড অফকোর্স—' মিঃ রাও যেন বরফের কফিনে পড়ে থাকা বস্তুগুলোকে গুনছিলেন আবার বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছিলেনও।

'আমি তো আমার শয্যা-সংখ্যার হীরক-জয়ন্তী পালন করেছি …মানে একশতেরও বেশী মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি আমি…' মিস্টার মদান তার হীরের আংটি পরা হাতটা মিঃ রাওয়ের কাঁধের ওপর রেখে বলতে লাগলেন, 'সবনাম তো আমার মনে নেই তবে খেলাটা সুরু করার জন্যে…'

'এ সবই চরম বিরক্তি কর—' সুলতান নিজের মনেই কথাগুলো বলে ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'আর বিমান-সেবিকার কথাটা ভুলে গেলেন? তার নামটা জুড়ে দেবেন না?—' ডক্টর রাওয়ের গলার স্বর যেন দূর থেকে ভেসে এল। জবাবে মিঃ মদানের হাসিটাও যেন বহু দূর থেকেই শোনা গেল। কিন্তু, মীনু আর সুলতানের কানে যেন কয়েকটা চিলের কর্কশ চিৎকার ঝাপ্টা মেরে চলে গেল।

মীনুর হাত আপনা হ'তেই কানের ওপর চাপা দিল। ভ্রমিত

-স্বরে সে বলতে লাগল, 'যদি এখন আমার কাছে একটা টেপরেকর্ডার থাকত তাহলে এই সব কথাবার্তা টেপ করে এই বরফের নীচে রেখে দিতাম। হয়তো কোন দিন, কেউ, সেটা বরফের তলা থেকে উদ্ধার করতো, তারপর নিজেদের সভ্যতার নমুনা দেখতো…'

'লেট্ আস গো এ লিটল অ্যাওয়ে—আমরা একটু দূরে সরে যাই চলো।' সুলতান বলল।

হঠাৎ মীনুর সেই মেয়েটার কথা মনে পড়লো, বিমানের সীট ছেড়ে যে বাইরে বেরিয়ে আসে নি।

'সেই বেচারী মেয়েটা—' মীনুর মুখ থেকে স্বতঃই বেরিয়ে এল কথা কটা। সুলতানকে বলল, 'আমি বিমানের ভেতরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসি একবার!'

'দ্যাট পুওর গার্ল'—সুলতানেরও মনে পড়ে গেল। মীনুর সঙ্গেই যেতে যেতে সে জিজ্ঞেস করল: 'তোমাকে ওই মেয়েটি নিজের কোন নামটাম বলেছিল না কি?'

'বিমানেই তো দেখেছি। কিন্তু কথাটথা তো আমি বলি নি।'

'অ্যাথেনে বিমান বদলাবার সময় ওকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছিলো। নিজের হাতে এক কাপ চা-ও তুলে নেয়নি বা কোন ঠাণ্ডা সরবৎ টরবৎ। তখন আমিই ওকে এক পেয়ালা চা এনে দিয়ে ছিলাম। ও বলছিল যে একাকীই ও ইংলণ্ডে যাচ্ছে। কেন জানো? বিয়ে করতে।'

'বিয়ে করতে?'

অনেক বছর আগে ওর বাপ সেখানে চলে গেছেন। ও বলছিল যে এত বছর বাদে কি জানি ও নিজের বাপকেই চিনতে পারবে কি না। বারো বছর পর সেখানে ও নিজের বাবাকে দেখতে পাবে তো।'

'মাই গড!'

'ওর বাবা চলে যাবার পর মা মারা গেছেন। কয়েক বছর ও নিজের খুড়িমার কাছে ছিল। হঠাৎ একদিন ওর বাবা ওর নামে

টিকিট পাঠিয়ে দিল। সেখানেই বিয়ের ঠিকঠাক করে রেখেছে বাবা। এখন ওকে আনিয়ে বিয়ে টিয়ে দিয়ে দেবে আর কি…'

মীনু আর সুলতান যখন বিমানের ভেতরে ঢুকলো, ওদের মনে হলো অভ্যন্তরের আঁধার যেন ধীরে ধীরে ওদের চারপাশে জমতে জমতে ফোঁপাতে সুরু করেছে। মীনু আন্দাজেই, কিন্তু তৎপর গতিতে সেই সীট লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল যেখানে বসে সে মেয়েটার কাঁধের ওপর কম্বলটা ছুঁড়ে দিয়েছিল।

কম্বলের গাঢ় শ্লেট রঙ ঘিরে আসা গাঢ় আঁধারের মতই আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

মীনু ধীরে সেই কম্বল ধরে নাড়া দিল। সেই মেয়েটির মাথা ওরই দু'হাঁটুর ফাঁকে ডুবে গিয়ে যেন একসঙ্গে জুড়ে গেছলো। মীনু কতক্ষণ চুপচাপ ওর মাথার ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো।

'ও বোধহয় নিজের নাম বলেছিল, জীতো…' সুলতান মীনুকে বলল।

'জীতো…ছাখ জীতো…তুই একা নয় আমরা সবাই…।'

মীনু দুহাত দিয়ে ওর মাথাটা দু'হাঁটুর ফাঁক থেকে তুলে ধরলো।

মেয়েটি অতি কষ্টে, জোর দিয়ে যেন চোখ খুললো, মীনুর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু চোখের পাতা এমন কাঁপতে লাগল যে মীনুকে চিনতে পারলো কিনা বোঝা গেল না।

কম্বলের ভেতর দিকে সামান্য লাল রঙের মত দেখা গেল। মীনু যেই মেয়েটার হাত ধরবার জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল, ওর হাতে হাত পড়তেই হঠাৎ কেমন কেঁপে উঠলো।

'জীতো!' মীনু ঝুঁকে জীতোর মুখের দিকে তাকালো। মুখটা ওর যেন মাংসহীন ছায়ার মত বোধ হলো।

'আই থিংক শী শুড ঈট সামথিং—কিছু খাওয়া দরকার মেয়েটার… এয়ার হোস্টেস মেয়েটা বোধহয় কেবিনেই আছে, আমি দেখছি। এখনও কিছু খাবার দাবার বিমানের মধ্য থাকা উচিত।'

'আমি কিছু খাব না।' হঠাৎ জীতোর আওয়াজ ফেটে পড়লো।

'বোকা মেয়ে কোথাকার! ত্থাখ, আমরা মরলে তো সবাই মরবো, কিন্তু না খেয়ে মরবো কেন? আমিও খাবো তোর সঙ্গে কিছু।' মীনু যখন কথা বলছিল, সে সময়ই জীতোর শরীরে যেন নতুন বল-সঞ্চার হলো। আর সে বলে উঠল, 'আমার বাক্সে তো অনেক পিন্নি-ছাতু গুড় দিয়ে তৈরী মিষ্টি আছে। তুমি সব খেয়ে নাওনা।'

'নিয়ে আয়! আমি তো নিশ্চয়ই খাব—' মীনু হেসে ফেলে বলতে লাগল, 'না খেয়ে মরে লাভ কি!'

জীতো সীটের নীচে, ডানদিকে যেই হাত বাড়িয়ে দিল তো একটা ঝনাৎ শব্দ হলো। শব্দটা আগেও শুনেছিল মীনু কিন্তু কিছু ঠাহর করতে পারেনি। এখন দেখল জীতোর হাতের সঙ্গে মঙ্গলসূত্র বাঁধা রয়েছে।

মীনু মুখে কিছু বলল না। কেবল হাত বাড়িয়ে সেটাকে স্পর্শ করে জীতোর মুখের দিকে তাকালো।

'আমার কাকীমা বেঁধে দিয়েছে এটা। আর দিব্যি করিয়ে নিয়েছে যে বিলেতে গিয়ে যখন আমার বিয়ে হবে তখন যেন এটাকে বালার মত পরে নিই। কিন্তু কাকীমা আর জানবে কি করে—' জীতোর মাথা আপনা হতেই নীচের দিকে বাড়ানো হাতের ওপরই এলিয়ে পড়লো।

মীনু জীতোর পাশের সীটে বসে পড়লো।

'এই চুনরী রঙীন কাপড়ের ওপর সাদা বুটি আর মাঝে মাঝে চুনী বসানো, আমার মায়ের হাতে তৈরী—' জীতোর গলার স্বর একবার বেজে উঠেই ফের নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

মীনু যে একবার শ্লেট রঙের কম্বলের ভেতর লাল রঙের কি দেখতে পেয়েছিল সেটা জীতোর মাথায় ঘোমটার মত দেওয়া ওর মায়ের তৈরী চুনরীই ছিল।

এ জীতোর কেমন বিয়ে—যে মৃত্যুকে বরণ করার এক পল আগে জীতো নিজে নিজেই রচনা করে নিলো? —মীনু বলল না কিছুই।

কিন্তু ভেতরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠলো !

জীতোর বোধহয় আবার পিন্নিগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। ও একটু চমকে উঠল আবার নীচে হাত বাড়িয়ে একটা প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগ বার করে এনে মীনুর সামনে রেখে দিল।

মীনু ব্যাগ থেকে একটা টুকরো সুলতানের হাতে দিল, আর এক টুকরো জবরদস্তি জীতোর মুখে গুঁজে দিল আর তৃতীয় টুকরোটা হাতে নিয়ে সীটে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'জীতো! এখানে অন্ধকারে একলা বসে থাকে না। চল, খানিকক্ষণের জন্যে বাইরে আয়।' মীনু কথাটা বলে জীতোর একটা হাত ধরলো।

'না বোন। আমাকে এখানেই থাকতে দাও—বাইরের নির্জনতায় আমার বড় ভয় করে—' জীতো যেন প্রার্থনা করল মীনুর কাছে। মীনু ওর হাত ছেড়ে দিল।

বাইরের ঠাণ্ডা আর সীমাহীন বরফের নির্জনতা বুঝি সবার পক্ষেই সহ্যকরা কঠিন হয়ে পড়েছিল, যারা বাইরেই ছিল এতক্ষণ। মীনু দেখল—

মীনু বিমানের বাইরে চলে এল। সুলতানও ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল তো মীনু একবার অন্ততঃ বলল, 'তুমি চাইলে ভেতরেই বসে থাকতে পারো!'

কিন্তু সুলতান কোন উত্তর দিল না দেখে মীনু আর কিছু বলল না?

তখন অপরাহ্নের কনে দেখা আলোতে চারিদিক উজ্জ্বল। শ্লেট রঙের সন্ধ্যা নামার আগে যেন কিছুটা গোলাপী রঙের ছটা, যেন যাবার আগে ধীর ভাবে ধরিত্রীর গলা লড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে কিছু বলে যাচ্ছে।

'আই অ্যাম নট সরি ফর মাইসেল্ফ—নিজের জন্য আমি মোটেই ছুঃখিত নই—' মীনু উন্মুক্ত বরফের প্রান্তর তৃষিত নয়ন মেলে পান করতে করতে সুলতানের দিকে ফিরে বলল, 'আই ওয়াজ ওনলি

এ লিটল্ সরি ফর হার—মেয়েটার জন্যই আমার যা একটু দুঃখ হ'চ্ছে—'

'খুবই মর্মস্পর্শী ব্যাপার—' সুলতানের চোখে বুঝি জল ভরে এল। মুখ ফিরিয়ে নিল সে। তারপর একটু সামলে নিয়ে ভিজে গলায় বলল, 'কারও জন্যে অপেক্ষা করে থাকা।'

'আমার ধারনা, ও বোধ হয় জানেই না যে কার সঙ্গে ওকে বিয়েতে বসতে হবে—কেউ একজন—জানা নেই—কেমন সে—একটা কেবল বিশ্বাস—ও কল্পনা করলো তাকে, আর তার সঙ্গেও ওর বিয়ে হয়ে গেছে বলে ধরে নিলো।'

'এ এক বেদনাদায়ক দৃশ্য।'

'তা বটে—' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মীনুর বুক ভেঙ্গে। বলল, 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে ও বিমান ছেড়ে বাইরে আসুক। তারপর মনে হলো যে—না, ও এখানেই ঠিক আছে ; একটা স্বপ্ন নিয়ে ও নিজেকে ঘিরে রেখেছে যেখানে, সেখান থেকে বাইরে উঠে এলে ভেঙ্গে যেতে পারে সেটা—'

'মনে নেই, কার গল্প, কোথায় পড়েছিলাম,—একজন লোককে—কয়েকজন লোক হত্যা করতে চাইছিল—সেই লোকটা খুবই সাধারণ আর নির্দোষ, নির্বিরোধী লোক। সে কেবল এই আশায় সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিলো যে একদিন না একদিন তার নিজস্ব একটা কুঁড়ে ঘর হবে আর তার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাবে, একটা খরগোশের বাচ্চা পুষবে সে, গোটা দুই মুর্গী···তো ওই লোকগুলো তাকে হত্যা করার আগেই তার এক বন্ধু তাকে একাকী সঙ্গে করে নিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে এল। তারপর সেই বন্ধুটি তার পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে দূর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী দেখালো আর বলল যে ওখানে আমরা একটা ঘর বানাবো,—একটা খরগোশ রাখবো—দুটো মুরগী কিনবো, তারপর মুর্গীদের বাচ্চা হবে—সারা জীবনের স্বপ্ন যখন তার চোখের সামনে সাকার হয়ে উঠেছে তখন তার বন্ধু পেছন থেকে তাকে গুলি করে মারলো—'

'আহা, কি দয়ার্দ্র সুকৃতি—'

মীনু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লো। যতদূর দৃষ্টি যায়, প্রসারিত বরফের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। তারপর সুলতানের দিকে তাকালো। বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালই লাগছে···'

'মীনু···' সুলতান কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

'মীনু তাকালো ফের ওর দিকে। এমনভাবে, যেন চুপ হয়ে যাবার কারণটা জানতে চাইছে। চুপ করে থাকার চেয়ে কিছু একটা বলাই সহজ মনে হলো সুলতানের। বলতে লাগল, 'আমি একজন স্থপতিবিদ্, এই সবে ডিগ্রী নিয়ে এসেছি। প্রথমে কিছুদিন ইংলণ্ডে থেকে তারপর জার্মানীতে যাওয়ার কথা, ডক্টরেট করতে··· এখনও অবশ্য নিজের হাতে কোন বাড়ী বানাবার সুযোগ হয়নি। আর বানাবার কোন আশাও নেই। এখন শুধু—' পরের কথাগুলো বলতে বাধো বাধো ঠেকলো সুলতানের। সেজন্যে কেবল এইটুকুই বলতে পারলো, 'যদি তুমি রাজী থাকো—'

'আমি ঠিক বুঝলাম না, সুলতান!' মীনু একটু ইতস্ততঃ করে বলল।

'একটা উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা—' সুলতান হেসে ফেললো। হাসিটা, বোধ হয় তার গলায় আটকে থাকা সঙ্কোচকে ঝেড়ে ফেলার জন্যই। সে বলতে লাগল, 'বিমানের মধ্যে কোনরকম একটা যন্ত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে। সেটা দিয়ে আমি একটা কবর তৈরী করে···'

মীনুর মনে হলো সুলতানের চোখে জল ভরে আসছে অথচ ঠোটের কোণে হাসিটুকু লেগেই আছে। ও বলতে লাগল, 'কিন্তু স্থপতিবিদ্ সাহেব দুটো কবর তৈরী করতে হবে··· একটা আমার জন্যেও।'

'শুধু একটাই। দুজনের জন্যে!' সুলতান ঠোঁট খুলল, বন্ধও করলো; আর সেই সঙ্গে এক হাত দিয়ে মাথাও মুছলো। এই ভীষণ ঠাণ্ডাতেও ওর মাথার তালুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল।

মীনুর দুই চোখ পলকের জন্য বুঁজে এল। শরীরের ভেতরে

রক্তের দাপাদাপি যেমন কেউ কান পেতে শোনে···

'আমি ভালবাসি এই জীবনটাকে'. মীনু চোখ খুলে সুলতানের দিকে তাকালো. 'সুলতান্! এই মুহূর্তে জীবনকে অস্বীকার করার কথা বলা বোধহয় জীবনেরই অপমান করা···'

'শুধু এটুকুই নয়···' সুলতান মীনুর একটা হাত ধরলো. 'তার চেয়েও কিছু বেশী···

'আমারও তা-ই মনে হয়—' মীনু যতটা সুলতানকে তার চেয়েও বেশী যেন নিজেকে লক্ষ্য করেই বলতে লাগল :

'আমি কখনও কাউকে ভালবাসিনী—একটা অস্বচ্ছ কল্পনা—তুমি—হয়তো—' মীনুর ঠোঁটের অসমাপ্ত কথাগুলো সুলতান নিজের ওষ্ঠাধরে গ্রহণ করে নিলো।

বরফ আচ্ছাদিত এই উন্মুক্ত প্রান্তর বিশাল এক কবরখানার মতই। বাতাস তার দুহাত ভরে ওপর থেকে বরফ ফেলে ফেলে এই কবরটাকে যেন ভর্তি করে দিচ্ছিলো। কিন্তু যে মুহূর্তে সুলতানের বাহুদ্বয় ছটফটিয়ে উঠে মীনুকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিলো, সে মুহূর্তেই বাতাস আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, যেন কবরটা ঢাকা পড়ে যেতে তার হাতদুটো সহসাই কিংকর্তব্য বিমূঢ়!···

'মীনু···' সুলতানের ঠোঁট দুটো মীনুর দুই ঠোঁট থেকে এই শব্দটাকে প্রশ্বাসের মত পান করে ফের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাস মিলিয়ে দিল।

'এবার আমি যে কোন মুহূর্তে মরে যেতে প্রস্তুত—' বরফে ভিজে যাওয়া মীনুর কেশরাশিতে আলতো ঠোঁট ছোঁয়ালো সুলতান, যেন সে ভিজে চুলগুলো তার প্রশ্বাসে শুকিয়ে দিতে চাইছিল। তারপর কাঁধের ওপর গড়িয়ে পড়া স্কার্ফটা মীনুর মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিল।

'সুলতান—' মীনুর গলার শব্দও কেমন ভিজে ভিজে। বোধহয় ওর সারা মনের দেয়ালে কিছুক্ষণ আগের কথাগুলোই ভিজে লেপ্টে ছিল— 'আমি যে মৃত্যুর কথা ভেবে বলেছিলাম, সেগুলো শুধু

মৃত্যুক্ষণের কথাই ছিল না। যখন বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই সামনে এসে উপস্থিত হয়, তখন এমনটাই মনে হয়—একা, অথবা কারো সঙ্গে, সে একই কথা—কিন্তু এখন এই মুহূর্তে—'

'ওহ্, মীনু—' সুলতানের গলা রুদ্ধ হয়ে গেল, 'তুমি বলেছিলে তো, কিন্তু আমিও তো এই তফাৎটুকু কখনও এমনভাবে দেখতে পাইনি।'

'মনে হচ্ছে—এক পলকেই যেন জীবনের কতগুলো বছর কাটিয়ে এলাম! এমন মুহূর্ত, সত্যিকারের বেঁচে থাকার বছরগুলোতে কদাপি আর আসে নি।' মীনু সুলতানের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন তার অস্তিত্ব মাত্র এক মুহূর্তেরই জীবন্ত অস্তিত্ব! আর সেই জীবন্ত মুহূর্তটিকেই শাশ্বত করে তার মধ্যে লীন হয়ে যেতে চাইছিল সে—একটুও কম নয়, একটুও বেশী নয়।

'সুলতান!' মীনু সুলতানের বুক থেকে মাথা তুলল, তার মুখের দিকে দেখল, 'বরফের কবরে তো কিছু লেখা যাবে না, কিন্তু যা লেখা যাবে, আমিই লিখে দিচ্ছি। দুটি মুহূর্তের মৃত্যু হয়েছে এখানে।'

সন্ধ্যার প্রথম আঁধার পাখী এই বরফের দেশের ওপর তার পক্ষ বিস্তার করলো। কিন্তু সুলতানের মনে হলো যে মীনুর কথা শুনে সেই আঁধার পাখীটা যেন একবার চোখের পাতা নাচালো, বুঝি বা যে কথাগুলো কবরের ওপর লেখা যায় নি, সেই কথাগুলো পড়ে নেবার জন্য—এ ছিল অস্তমান সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি। সুলতান আবার একবার মীনুর ঠোঁটে চুমু খেলো। বলল, 'তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি বিমান থেকে কোন একটা অস্ত্র নিয়ে আসি।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি!' মীনু বুঝি এই মুহূর্তটিকে হারাতে চাইছিল না। সুলতানের সঙ্গেই বিমানের দিকে ফিরলো। চলতে চলতে সে সুলতানের হাত ধরলো আর একবার শুধু এটুকু বলল, 'কিন্তু একজন মানুষ, যিনি বেঁচে থাকতে প্রস্তুত—আবার মরে যেতেও প্রস্তুত।'

একটা আহত দানবের মত হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চল, মৃতকল্প পড়ে আছে বিমানপোতটা। ভেতরে যে কজন লোকই ছিল, তাদের গুমরানো কান্নার শব্দ যেন বিমানপোতটার বিভিন্ন অঙ্গের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে চরাচরে মিশে যাচ্ছিল।

অনেকেই আবার মদের নেশায় চুর হয়েছিল—হুঁশন ছিল না তাদের। মিঃ সিংহের ঘুমন্ত মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে কি সব কথা যেন বেরিয়ে আসছিল। মিঃ শর্মা বোধ হয় কয়েকবার বমি করেই ফেলেছিলেন। তার সীটের পাশ থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। বিদেশী যাত্রীরাও বুঝি যথেচ্ছ পান করেছিল; শুয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছিলো। কেবল মিঃ মদানের হাতে এখনও সেদিনকার খবরের কাগজটা ধরা ছিল, যা অন্ধকারের মধ্যে পড়া সম্ভব ছিল না। তবু তিনি সেটা হাতে ধরে রেখেছিলেন আর আশপাশের শুয়ে পড়া লোকেদের উদ্দেশ্যে বলে যাচ্ছিলেন, 'কাল এই খবরের কাগজেই আমাদের মৃত্যুর খবর ছাপা হবে—এখানে—প্রথম আলো ফুটলে—সারা দুনিয়া খবরের কাগজ পড়বে—কেবল আমরাই পড়তে পাবো না—'

'আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' মীনু বলল সুলতানকে। সুলতান ভেতরের কেবিনে চলে গেল।

সুলতান যখন বিমানের বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন ওর খালি হাত। খালি হাতেই সে মীনুকে ধরে পূর্ণ হলো: 'মীনু! আমাদের সেই মুহূর্ত দুটি মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে—'

'কি বলতে চাইছো?' মীনু জিজ্ঞেস করতে চাইল, কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরুল না, ওর ঠোঁট সুলতানের ঠোঁটে মিশে রইল।

'আমার মনে হয় মরার জন্য তুমি প্রস্তুত।' একবার ঠোঁট সরালো সুলতান, মীনুকে জিজ্ঞেস করল। মীনু মাথা নেড়ে জানালো 'হ্যাঁ'।

তখন সুলতান ফের জিজ্ঞেস করল, 'এবং বেঁচে থাকতেও!'

'হ্যাঁ, সুলতান।'

'প্লেনের রেডিও খবর পাঠাতে পারবে না, কিন্তু গ্রহণ করতে পারছে। এখনই খবর পাওয়া গেল যে আমাদের বিমানের অনুসন্ধান করা হচ্ছে।—'

'ওহ্, সুলতান!' মীনু সুলতানের বুকে মাথা রাখলো।

সুলতানের মনে হলো যে মীনুর ঠোঁট বড্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠোঁট তো বটেই, মাথাও—হাতও।

'মীনু!'

'আমি মরতে ভয় পাইনি!'

'আমি জানি।'

মীনু আর কিছু বলল না। চোখ দুটি জলে ভরে এল।

তারপর, কি জানি সুলতানের নিঃশ্বাসে কি ছিল, ছিল মীনুর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসেও; মীনু আবার মাথা তুললো, সুলতানের মুখের দিকে দেখল, 'এবার আমি আত্মস্থ। জীবনটাকে নিয়েই একটা ভাবনায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি ঠিক আছি। এসো জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াই।'

আলোকের একটা উষ্ণ টুকরো অন্ধকার বরফের প্রান্তর ভেদ করে গেল। যেন হারিয়েই গেল মনে হতে হতেই আবাব ফিরে এল—

'সার্চলাইট।' সুলতানের হাত দুটো আকাশের দিকে উঠে গেল; তারপর মীনুর দিকে, 'ওরা খুঁজছে।'

'দুটি মুহূর্ত!' মীনু বলল, তাবপর সুলতানের বাহুর ঘেরে সামান্য এক নারীর মত এলিয়ে পড়লো, যেন একটা যুক্তি খুঁজে নিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিল। তারপর বলতে লাগল, 'আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষ দুটি মুহূর্তের খোঁজে থাকে।'

জীবিকার সম্মান

হাতের ওপর বসিয়ে রাখা বটের-পাখীটাকে সে জালের তৈরী রঙীন থলেতে বন্ধ করে রাখল। তারপর বুরুশের পাটগুলোকে হাতুড়ী দিয়ে পিঠে পিঠে ধারগুলো সমান করছে দেখে, তাকে জিজ্ঞেস না করে আর থাকতে পারলাম না, 'মিঞাজী! তাহলে এই সখও আপনার আছে?'

'আল্লামিঞা তো দুটো সখই আমাকে দিয়েছেন মেম-সাহেব! এক আমার জীবিকা বা বৃত্তি আর এক এই বটের পাখী-দের সখ! খাস ইংরেজের কুঠিতেও যখন কাজ করেছি এই বটেরকে হাতে নিয়েই করেছি। পাতিয়ালার মহারাজা, আনোয়ারের মহারাজা, কাপুরথালার মহারাজা···বড় বড় শৌখিন মেজাজের ব্যক্তিরাও আমার এই দুটো জিনিসই মেনে নিয়েছেন।' কথাগুলো বলে সে বুরুশটাকে হাতে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালো। তখন সত্যিই মনে হলো যেন তার বৃদ্ধ পিঠের ওপর নবীন যৌবন চমক দিয়ে উঠল।

'খুব ভালো সখ আপনার বলতেই হবে।' আমি তার বৃত্তি নয়, বটের পাখীর সখের কথাই বলছিলাম।

'এই সখের কথা আর কি বলব' আপনাকে! একবার লক্ষ্ণৌ-এর এক বাঈজীকে পাতিয়ালার মহারাজা সিমলাতে বটের পাখীর লড়াইতে আহ্বান জানালেন। বলে তো দিলেন। দশ হাজার টাকার বাজীও ধরলেন। তারপর মহারাজের মনে হলো যদি সামান্য এক বাঈজীর বটের তাঁর বটের বটেরকে হারিয়ে দেয়, তাহলে লোকে কি বলবে? কিন্তু, কথা তো মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েই গেছে···'

'তারপর?'

'তারপর আর কি মেমসাহেব! নাসিম বাণু ছিল সেই বাঈজীর নাম। সে তো লাহোর থেকে বাইশ-শ' টাকা দিয়ে একটা বটের আনিয়ে নিল। তারপর মহারাজকে বলে পাঠালো···' আমি তো

সামান্য এক বাঁদী মাত্র। আপনার মুকাবলা করার ক্ষমতা তো আমার নেই। কিন্তু এটা হলো শখ-ভালবাসার কথা। এর মর্য্যাদা তো দিতেই হবে। বটের লড়াইয়ে উভয় পক্ষই সমান। সে জন্যেই, লড়াই যখন চলবে তখন মহারাজকেও এই বাঁদীর সঙ্গে এই আসনে বসতে হবে, একই জায়গায়। মহারাজের জন্য আলাদা করে বিশেষ আসনের বন্দোবস্ত করা যাবে না···'

একথা সত্যিই, আমি ভাবছিলাম যে সব বৃত্তিরই একটা আলাদা মর্য্যাদা তো নিশ্চয়ই আছে। তা যদি বটের পাখীদের লড়াই হয়, তাহলেও আছে। যেমন লক্ষ্নৌ-এর মুরগীর লড়াইতেও আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা মহারাজ কি মেনে নিলেন?'

'মেমসাহেব, এ হলো কথার মর্য্যাদা রাখার প্রশ্ন। বাঈজীর কথা শুনে একবার তো নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টি ঝুঁকে পড়েছিল, তবে মেনে নিলেন।'

'তারপর কার জিত হলো?'

'মহারাজের বটেরই জিতলো। বাঈজীর বটেরও ভীষণ লড়েছিলো। কিন্তু শেষে এত জখম হয়ে গেল যে ময়দান ছেড়েই পালালো। বিশ হাজার তাপ্পি দিয়ে সেলাই করতে হয়েছিল সেই জখমি বটেরকে। তবে হারতো হারই। জখম হলো কি না হলো সেটা কোন অজুহাতই নয়।

'সেই তওয়াইফ দশ হাজার টাকাও তাহলে দিয়ে দিয়েছিলো?'

'আলবাৎ দিয়েছিলো।'

'আর আপনার এই বটের পাখীটা, মিঞাজী? এর কত দাম হবে?'

'বটেরের তো ততটাই দাম যতটা সে জীতে আনতে পারে। আমার এই—বটেরের দাম মাত্র দুশো টাকা। বয়েস যখন ছিলো অনেক দামী দামী বটের রেখেছি। মুস্ক্ খাইয়ে খাইয়ে পালন করেছি। মুস্ক্ কি জিনিস জানেন তো মেম-সা'ব? হরিণের নাভি থেকে বেরুনো কস্তুরী খুবই দামী খোরাক···'

কথা বলছিল, কিন্তু তার হাত কাজও করে যাচ্ছিলো। দেখে মনে হচ্ছিলো—ছুটো হাত, ছু'রকম কাজের জন্য তৈরী হয়েছে—একটা হাত বটের পাখীটাকে ধরে রাখার জন্যে, আর একটা হাত রঙ-বেরঙের তুলি বা বুরুশ ধরবার জন্যে।

বইয়ের আলমারী থেকে সে বই-পত্তর বার করে একটা টেবিলের ওপর জড়ো করে রাখল। তারপর খবরের কাগজের পাতা খুলে খুলে রঙের ছিটে থেকে বাঁচাবার জন্যে ঢেকে ঢেকে রাখছিলো বই গুলো।

এই সময় ঘন্টি বাজল। কয়েকজন নবীন লেখক দেখা করতে এসেছেন। বাইরের বারান্দাতে কলিকে ফেরানো হয়ে গেছে। সে জন্যে লোকজন সাক্ষাৎ করতে এলে যাতে বসতে পারে, তাই কয়েকটা মোড়া আর চেয়ার রাখা রয়েছে। ভেতরের কামরার জন্যে অবশ্য চিন্তা ছিল না। মিঞাজীর বক্তব্য তো শুনেই নিয়েছি যে ঘরের চাবি মিঞাজীকে দিয়ে যদি কেউ বাইরে চলে যায় আর ফিরে এসে চাবি ফেরৎ নেয়, তো ঘরের জিনিস পত্তরও যেটা যেখানে থাকার তে থাকবেই, উপরন্তু—সমস্ত ঘরটাই একেবারে চক্‌চকে ঝক্‌-ঝকে হয়ে যাবে! কোনরকম কষ্ট বা ক্ষোভের কারণ থাকবে না।

দেখা করতে যারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন মহাশয় পাঞ্জাবী সাহিত্যের কিছু বাছাই করা কবিতা এবং কাহিনীর সংগ্রহ করছিলেন একটি। এই নিয়ে ছুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি সুরু হয়ে গেল। কাকে কাকে এই সংগ্রহে স্থান দেওয়া উচিত, এবং কাকে কাকে না দেওয়া উচিৎ। এই চিন্তাও তারা করছিলেন যে, যে সমস্ত লেখকের নামের সঙ্গে চোট-বড় পুরস্কারের তক্‌মা আঁটা আছে, তারা তাহলে কোন্ স্তরে পড়ছে!

হাসি পেয়ে গেল আমার। বাইরের বারান্দায় বসে থাকা লেখকদের দেখে মিঞাজীকে মনে পড়ে গেল—মিঞাজী নয়, মিঞাজীর বটের,—কি? না, কোন বটের ছুশো টাকাও হয়, কোনটার বা বাইশশো, আবার কোনটা দশ হাজারীও বটে···

ভেতরটা কেমন কশকশ করে উঠলো! খেতাব আর পুরস্কার যারা বণ্টন করে, তাদেরও বোধহয় বটের পাখীদের লড়াই দেখার শখ আছে বেশ···ফলে কোন লেখক এক হাজারী হয়ে গেল তো কেউ পাঁচ হাজারী, কেউ আট হাজারী ··আর কেউ কেউ সেরেফ্ ক্ষত-বিক্ষত—রক্তাক্ত···

লেখকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লেখকদের সম্মান নিয়ে কথা উঠলো। যারা দেখা করতে এসেছেন তাদের একজন বলতে লাগলেন—এবার কন্‌ফারেন্সে যে পেপারটা পড়া হলো···এইসব য়ুনিভার্সিটিতে যে পেপার পড়া হলো···এইবার···কথা তো অনেক, এ বছরের যেমন, গত বছরেরও কম নয় কিছু ; কিন্তু বক্তব্য সেই এক, —অমুকের পেপারে যে তমুকের নামোল্লেখ থাকবে না তা প্রথম থেকেই বলে দেওয়া যায় ; আব তমুকের প্রবন্ধে খামোখা অমুককে নিয়ে নাচানাচি করা হয়···

আবার মিঞাজীর কথা মনে পড়ে গেলো—তার মুখে শোনা সেই লক্ষ্ণৌ-এর তওয়াইফের কথা—এ হচ্ছে শখ-ভালবাসার কথা, সেজন্যেই এই লড়াইয়ের সময় মহারাজও ঠিক সেই জায়গায় বসবেন, যেখানে সেই বাঁদী যসবে। মহারাজের জন্য বিশেষ আসনের বন্দোবস্ত কিছুই থাকবে না। এ হলো যার যার জীবনধারার প্রতি যোগ্য সম্মান দেওয়া—

সুতরাং, বটের পাখীদের লড়াই যারা দেখতে যান তাদেরও নিজ নিজ কর্মের ইজ্জৎ আছে বা থাকে। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'-র ইতিহাস অন্য যে কোনও ইতিহাসের চেয়েও বড়-অনেক বড়, সেজন্যে এ সম্বন্ধে যতরকম সম্ভব চিন্তা-ভাবনা করা যায়-যেতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই 'কিন্তু'-র সামনে 'চুপ-কর-ভাই' বলে দাড়ি টেনে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না—

আমিও চুপচাপ ছিলাম। তারাও চুপ করে গেলেন।

তারা চলে যাবার পর ভেতরের ঘরে গেলাম। তখন মিঞাজী তার সহকারীকে বলছিল,—'দশ সের চূনে সীসা যেন আধ সেরের

কম না হয়, খেয়াল রাখবে।'

তারপর মিঞাজী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আমার হাতে তৈরী এই তুলি দিয়ে রোজ অবশ্যই একবার ঝাড়পোছ করবেন। যদি রোজই দেওয়ালগুলো ঝক্‌মকে হ'য়ে না ওঠে তো তার দায় আমার।'

ভাবছিলাম—ভাবছিলাম যে মিঁঞাজীর মতো এই বিবেক এই আমাদের কালেও কি একইরকম আছে? মিঞাজী যে বললে—জিঙ্ক খুব দামী জিনিস। সে জন্যে সব কারিগরই জিঙ্ক বাঁচাতে চায়। বাঁচায়ও। কাজটাও জোড়াতালি দিয়ে করে দেয়। তারপর পয়সা পকেটে পুরে বাঁ হাতে একটা গেলাস ঠুকে হাওয়া! একবারও একটু ভাবে না যে কাজটা মন্দ হলো, কি ভাল হলো-সবারই এক কথা, পয়সা রোজগার করা তো ভাগ্যের খেলা। ভাল কথা। কিন্তু ভাগ্যের কাছে সুবিচারের দাবী না করে তারা কেন নিজের নিজের বৃত্তিকে সৎ পথে চালনা করে না?'

মনের মধ্যে কেমন একটা জ্বালা অনুভূত হয়! সব বৃত্তিই তো বৃত্তি, তা সে বুরুশেরই হোক কি কলমের। সব বৃত্তিই সম্মানের, এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।—

'এই খোকা, শোন! লোহার এই আলমারীটার সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াও!' মিঞাজী তার চেলা ছেলেটাকে বললে। ছেলেটা পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াতে মিঁঞাজী হুকুম করলেন, 'এইরকম সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে হবে না। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াও, পায়ের ওপর জোর দাও!' ছেলেটা সেইভাবে দাঁড়াতেই মিঞাজী বললে, 'এইবার জোর লাগাও, মেঝেতে পা গেড়ে নিয়ে ধাক্কা দিতে থাকেন। আলমারীটাকে পিছনে সরিয়ে দাও!'

'আমার যে কোমর ভেঙ্গে যাবে মিঞাজী।' জবাবটা শুনেই মিঞাজী বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে উঠলো, 'আরে, ভাঙ্গবে না, বরঞ্চ, এই জওয়ান বয়সেই যে কোমর বাঁকিয়ে ফেলেছিস—এই ধাক্কায় সিধে হয়ে যাবে।'

জওয়ান কোমর কিন্তু সত্যি সত্যিই হেরে গেল। কিন্তু মিঞাজীর বৃদ্ধ কোমর হেরে যায়নি। হেঁচকা টানে ছেলেটাকে দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটিয়ে দিল মিঞাজী।

'এই দিকে আলাদা একটা কি রঙ দেখছি মিঞাজী?' আমার দৃষ্টি ছাতের এক কোনের দিকে।

'আধ ঘণ্টাটাক অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন মেমসাহেব।'

'মেমসাহেব' সম্বোধন আমার স্বাভাবিক কারণেই ভাল লাগছিল না। মিঞাজীকে তো কিছু বলাও যাবে না। তাই চুপচাপ ওই বিশেষ কোনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বলে উঠলাম, "প্লাস্টার অফ্ প্যারিসের মত দেখতে লাগছে।'

'বুঝে ফেলেছেন?' সকালে এখানে আসবার সময় দেড় কিলো নিয়ে এসেছিলাম। কালকেই দেখে গেছলাম যে ওই কোনটাতে একটা কাটা দাগের মত পড়ে গেছে। ওখানে যদি আমি এক দুই করে ছ' কোট চুনও লাগাতাম ওই ফাটা দাগ কিছুতেই মিলিয়ে যেতো না। ব্যস! এক কোট্—প্লাস্টার অফ্ প্যারিস, তারপর দুকোট্ চুন; দাগের আব্বার হিম্মত আছে কি ফের উঁকি মেরে দেখবে?'

'মেনে নিচ্ছি, মিঞাজী। সত্যিই আপনি সাঁচ্চা বড় কারিগর।'

'মেমসাহেব, কাজ যদি দেখতেই চান তো হুকুম করুন! এমন জমানা ছিল যে চুন জলে ভিজিয়ে নয়, দুধে ভিজিয়ে কাজ করেছি।'

'চুন দুধে ভিজিয়ে?'—

'ব্যস! আর জিজ্ঞেস করবেন না যে দেওয়ালের চেহারা কেমন দেখতে লাগতো। মানুষের তেল-চুকচুকে চামড়ার মত চিকন হয়ে যেতো...'

'মিঞাজী, ময়লা জল মেশানো দুধের মতো বলবেন, যেমন বিক্রি হয়?' আমার হাসি পেয়ে গেল।

মিঞাজীর তাম্রবর্ণ চেহারায় যেন একটা ঝলকানি লাগল, 'মেমসাহেব! আমার সব কথাই ময়লা মিশিয়ে শুরু হয়, দুধও

মেশানো আর যা কামাই করি তাও ময়লা মেশানো।'

মিঞাজী বইয়ের আলমারীর পরিষ্কার করে ফেলেছে। তারপর আলমারী থেকে বার করে নেওয়া বইগুলো রাখবার জন্যে কয়েকটা বই যখন সে হাতে তুলে নিয়েছে, তার মধ্যে একটা ডিক্শনারিও ছিল। ভাবলাম, বলি যে মিঞাজী, এইবার আপনার ওই 'ময়লা' শব্দটার আসল মানেটা জানবার জন্য সকলকেই অভিধান দেখে নেবার জন্য ডাকুন! কিন্তু বললাম না কথাটা'।

মিঞাজী বলছিলেন, 'তারপর ওই চুনের মধ্যে শুধু দুধই নয়, ক্ষীরের, খোয়া ক্ষীরের টুকরোও মেশানো হতো। গরমে চুন মরে যায়, কিন্তু ক্ষীর তাকে মরতে দেয় না। তবে এসব তো অন্য যুগের কথা। এখন তো চায়ে খাবার চিনি পর্যন্ত মেলে না···'

বলতে বলতে মিঞাজী ঘুরে দাঁড়িয়ে একদিকের দেয়ালে তাকালো। তারপর দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে সাগরেদের দিকে—

'আহ্‌মদ জান! এই দেয়ালের ওপর পালিশ লাগিয়েছো?

'হ্যাঁ জনাব!'

'তোমার কি ধারনা যে তুমি সরকারী দপ্তরে কাজ করছো?'

'না জনাব!'

'তাহলে এই চুরি তুমি কিভাবে লুকোবে? এই দেখো—যদি তুমি চোখ খুলে দেখে পালিশ লাগাতে, তাহলে এই দাগটা এইভাবে থাকতো? তুমি বাবা সরকারী কর্মি না, আমার কর্মচারী। আমার কর্মচারী হয়ে চুরি হজম করতে পারবে না বাপ্‌।'

তারপর মিঞাজী দ্বিতীয় একটা কামরার দেয়ালের দিকে তাকালো। আগের মতই প্রথমে দেয়ালের দিকে তারপর তার কর্মচারীর দিকে—'

'ওই সামনে কি একটা দেখা যাচ্ছে বলতো খোকন?'

'টুল থেকে নামার সময় আমার হাত লেগে গেছলো, মিঞাজী।'

'পরিচ্ছন্ন দেয়ালে তোর ময়লা হাতটা লাগিয়ে দিল?'

'আমি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আবার তুলি চালিয়ে দেব।'

'না টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নয়।'

'আমার হাত তো অত উঁচুতে পৌঁছবে না, না হলে!'

'তুলিটা আমার হাতে দে।'

'আপনার হাতও ওখানে পৌঁছবে না।'

'তুমি নীচে ঘোড়া হয়ে বসো। আমি তোমার পিঠে পা রেখে হাতে পেয়ে যাবো।'

এই বলে মিঞাজী যখন সত্যি সত্যি ছেলেটার হাত ধরে তাকে মেঝের ওপর উল্টে বসিয়ে দিয়ে তার পিঠের উপর পা দেবার জন্য তৈরী হয়েছে, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে মিঞার হাতেও বুরুশটা চেপে ধরলাম।

'মরে যাবে যে মিঞাজী।

মিঞাজী এক পায়ের সামান্য ভার তার পিঠে ততক্ষণে চাপিয়ে দিয়েছে! আর এই জোয়ান ছেলেটা পায়ের ভার সয়েও চুপ হয়ে রয়েছে। মিঞাজী পা উঠিয়ে নিয়ে হেসে ফেললো, 'পরিষ্কার দেয়ালে ময়লা হাত লাগাবার তো এইরকম সাজাই দরকার—এই কম্‌বখত্‌ তো নিজের পেশার সম্মানটুকুও রাখতে জানে না—'

আলমারীতে বই সাজিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎই হাত দুটো থেমে গেল আমার! অন্ততঃ পাঁচশো কলমধারী—কিন্তু এই পেশা, এই জীবিকার সম্মান··· ?

বইভর্তি আলমারীটাও আজ কেমন খালি লাগছে আমার।